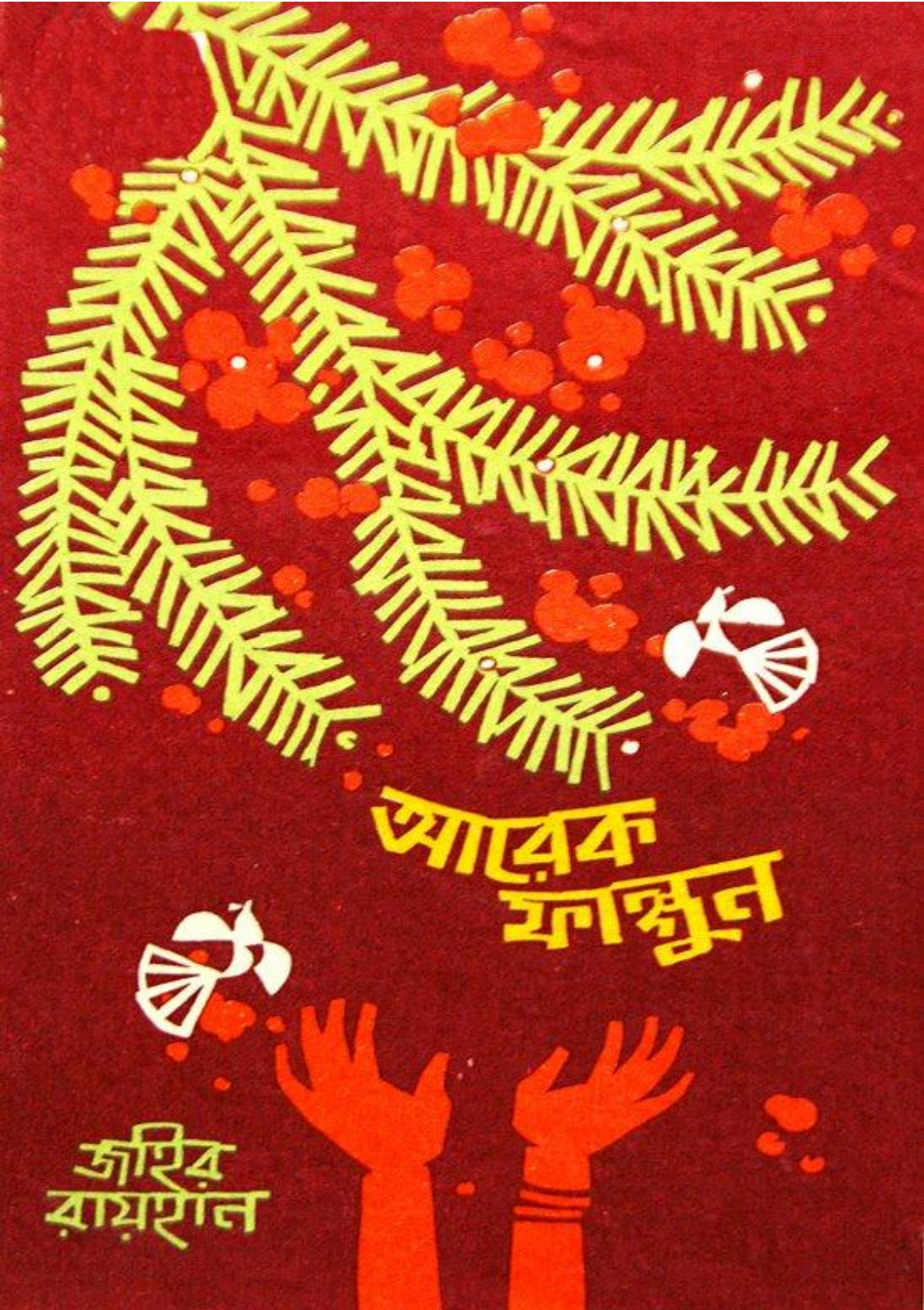
আরেক ফাল্গুন
জহির রায়হান

আরেক ফাল্গুন

জহির রায়হান

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books

Gooo...

www.dlobl.org

www.shishukishor.org

www.boierhut.com/group

রাত দুপুরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন বৃটিশ মেরিনের সেপাহীরা এসে ছাউনি ফেলেছিলো এখানে। শহরের এ অংশটার তখন বসতি ছিলো না। ছিলো, সার সার উর্ধ্বমুখী গাছের ঘন অরণ্য। দিনের বেলা কাঠুরের দল এসে কাঠ কাটতো আর রাতে হিংস্র পশুরা চড়ে বেড়াতো। শহরে তখন গভীর উত্তেজনা। লালবাগে সেপাহীরা যে কোন মুহুর্তে বিদ্রোহ করবে। যে ক'টি ইংরেজ পরিবার ছিলো, তারা সভয়ে আশ্রয় নিলো বুড়িগঙ্গার ওপর গ্রিনবোটে।

খবর পেয়ে যথাসময়ে বৃটিশ মেরিনের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছিলো আর শহরের এ অংশটা দখল করে তাঁবু ফেলেছিলো এখানে। সে থেকে এর নাম হয়েছিলো, আণ্ডার গোরা ময়দান। লোকে বলতো, আণ্ডা গোরার ময়দান। শেষরাতে লালবাগের নিরস্ত্র সেপাহীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিলো তারা। মানুষের রক্তে লালবাগের মাটি লাল হয়ে ওঠে। কিছু সেপাহী মার্চ করে পালিয়ে যায় ময়মনসিংহের দিকে। যারা ধরা পড়ে তাদের ফাঁসি দেয়া হয় আণ্ডা গোরার ময়দানে। মৃতদেহগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে ডালে।

লোকে দেখুক। দেশদ্রোহীতার শাস্তি কত নির্মম হতে পারে, স্বচক্ষে দেখুক নেটিভরা।

এসব ঘটেছিলো একশো বছর আগে। আঠারশো সাতান্ন সালে। আণ্ডা গোরার ময়দান এখনো আছে। শুধু নাম পালটেছে তার। লোকে বলে, ভিকটোরিয়া পার্ক।

সে অরণ্য আজ নেই। সমাঝে একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিলো। সে ঝড়ে কি আশ্চর্য, গাছের-ডালগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, আর গুড়িশুদ্ধ গাছগুলো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। লোকে বলতো, গাছেরো প্রাণ আছে। পাপ সইবে কেন?

তারপর থেকে আবাদ শুরু হলো এখানে। ঘর উঠলো। বাড়ি উঠলো। রাস্তা ঘাট তৈরি হলো। আর মহারানীর নামে গড়া হলো একটা পার্ক।

আগে জনসভা হতো। এখানে। এখন হয় না। শুধু বিকেলে ছেলে বুড়োরা এসে ভিড় জমায়। ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ দেয়। বুড়োরা শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেয়, চিনে বাদামের খোসা ছড়ায়।

এ হলো গ্রীষ্মে অথবা বসন্তে। শীতের মরশুমে লোক খুব কম আসে, সন্ধ্যার পরে কেউ থাকে না।

এবারে শীত পড়েছিলো একটু বিদঘুটে ধরনের।

দিনে ভয়ানক গরম। রাতে কনকনে শীত।

সকালে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল পুরো আকাশটা। আকাশের অনেক নিচু দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিলো এক টুকরা মেঘ। উত্তর থেকে দক্ষিণে। রঙ তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মত দেখতে।

ভিকটোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক মেঘের মত একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো নবাবপুরের দিকে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পরনে তার একটা সদ্য ধোয়ান সাদা শার্ট। সাদা প্যান্ট। পা জোড়া খালি। জুতো নেই। রাস্তার দু'পাশে দোকানীরা পসরা নিয়ে বসেছে। টাউন সার্ভিসের বাসগুলো চলতে শুরু করেছে সবে। ভিড় বাড়ছে। কর্মচঞ্চল লোকেরা গন্তব্যের দিকে ছুটছে রাস্তার দু'ধার ঘেঁষে। কিন্তু ওদের সঙ্গে এ ছেলেটির একটা আশ্চর্য অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। সব আছে তার। ধবধবে জামা। প্যান্ট। পকেটে কলম। কব্জিতে বাধা ঘড়ি। হাতে একটা খাতা। মুখের দিকে তাকালে, ভদ্রলোকের সন্তান বলে মনে হয়। কিন্তু, পায়ে জুতো নেই কেন ওর? জুতো অবশ্য এ দেশের অনেকেই পরে না। পরে না, পরিবার সমর্থ নেই বলে আর সামর্থ যে নেই ওদের জীর্ণ মলিন পোষাকের দিকে তাকালে বোঝা যায়। এ ছেলেটির পোষাকে কোন দৈন্য নেই। বরং আভিজাত্যের চমক আছে। তবে, এ পোষাক পরে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কেন সে?

এ দৃশ্য যাদের চোখে পড়লো, তারা একটু অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। তাদের চোখে হঠাৎ জাগা বিস্ময়। মনে ক্ষণিক প্রশ্ন। ছেলেটির মাথায় কোন ছিট নেই তো! পাগল নয় তো ছেলেটা?

কেউ কেউ তাকে নিয়ে ইতস্তত মন্তব্য করলো। আরে না না, পাগল না। ছেলেটার বোধ হয় কেউ মারা গেছে। তাই শোক করছে খালি পায়ে হেঁটে।

কেউ বললো, কে জানে এটা একটা ফ্যাশনও হতে পারে। আজকাল কত রকমের ফ্যাশন যে দেখি।

কেউ বললো, মহররমের তো এখনো অনেক দেরি, তাই না?

ছেলেটা তখনো হেঁটে চলেছে আপন মনে। মাঝে মাঝে সন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে সে। কি যেন তালাশ করছে। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চঞ্চল দুটো চোখ। আর যখন কোন লোকের দিকে তাকাচ্ছে সে, তখন তার মুখের দিকে না তাকিয়ে তার পায়ের দিকে দেখছে আগে।

এমনি করে যখন বংশালের মোড় পেরিয়ে গেলো সে, তখন একজনের দিকে চোখ পড়তে সারামুখে আনন্দের আবীর ছড়িয়ে গেলো তার। পেছন থেকে সে তাকালো, মুনিম ভাই, এই যে, ওদিকে নয়, এদিকে।

মুনিম পেছন ফিরে তাকালো।

গায়ের রঙ তার রাতের আঁধারের মতো কালো। মসৃণ মুখ। খাড়া নাকের গোড়ায় পুরু ফ্রেমের চশমা। পরনে একটা ধবধবে পায়জামা। পা জোড়া কিন্তু তারও নগ্ন। জুতো নেই।

মুখোমুখি হতে পরস্পরের দিকে স্নেহার্দ্র চোখে তাকালো ওরা। মৃদু হাসলো। হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলো দু'জনে। তারপর পথ চলতে চলতে মুনিম বললো, বাসা থেকে মা বেরুতেই দিচ্ছিলেন না। বুঝলে আসাদ। মায়ের আমার সব সময় ভয়, যদি কিছু ঘটে? আমার অবশ্য এসব বালাই নেই। আসাদ আস্তে

করে বললো, মা মরে গিয়ে বোধহয় ভালেই হয়েছে। থাকলে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করতো।

বলতে গিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

ঠাটারী বাজার পর্যন্ত সংখ্যায় ওরা দু'জন ছিলো। রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে গুলিস্তানের কাছে এসে পৌঁছতে সে সংখ্যা দু'জন ছাড়িয়ে দশজনে পৌছলো।

ওরা এখন দশজন।

দশজন মার্জিত পোষাক পরা নগ্ন পায়ের যাত্রী।

পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ একজন বললো, একি একসঙ্গে হাঁটছো কেন? আইনে পড়বে যে, ভাগ হয়ে যাও।

আসাদ চুপ করে ছিলো। সে বললো, জানো আমি যখন একা ছিলাম তখন সত্যি ভীষণ ভয় হচ্ছিলো আমার। এখন অবশ্য আর তা করছে না।

ঠিক বলছে। আমারও তাই। তাকে সমর্থন জানালো আরেকজন।

রমনা পোস্টাফিসটা পেছনে ফেলে ওরা যখন রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে এসে পৌছেছে তখন একটা পুলিশ বোঝাই লরী এসে আচমকা থামলো ওদের সামনে, একটু দূরে। তিন চারজন পুলিশ লরী থেকে নেমে রাস্তায় টহল দিতে লাগলো। পায়ে কালো রঙ দেয়া চকচকে বুট জুতো। পরনে খাঁকি পোষাক। মাথায় লোহার টুপি। হাতে একটা করে রাইফেল। পুলিশ দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো ওরা। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

একটি নীরব মুহুর্ত। তারপর আবার চলতে শুরু করলো।

আসাদ বললো, মনে হচ্ছিলো আমাদের ধরবার জন্যে লরীটা থামিয়েছে ওরা।

আমিও তাই ভাবছিলাম। বললো, আরেকজন।

মুনিম কিছু বললো না। পকেট থেকে রুমালটা বের করে নীরবে মুখখানা মুছলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সোজা উত্তরে, তার দু'পাশে আকাশমুখী যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে তার নাম দেবদারু। ফাল্গুন আসতে সে গাছের পাতা ঝরতে থাকে। ঝরে অনেকটা ইলিশেগুঁড়ির মত। ছোট ছোট সবুজ পাতাগুলো ঝরে পড়ে, রাস্তার ওপর সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। ভোরের দিকে সেখানে শিশিরের অসংখ্য সোনালি বিন্দু আলতো ছড়িয়ে থাকে।

সেদিনের সেই কুয়াশা ছড়ান ভোরে রাস্তা যখন অনেকটা ফাঁকা আর জনশূন্য তখন তিনটি মেয়েকে এক সারিতে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

তাদের সবার পরনে চওড়া পাড়ের ধবধবে শাড়ি।

প্রথমার চুলগুলো সুন্দর করে বিনুনী করা। মুখে তার চিকেন পকসের গুড়ি গুড়ি দাগ।

দ্বিতীয়ার দৈহিক গড়ন একটু ভারী গোছের। চেহারাটা সুন্দর আর কমনীয়। গায়ের রঙ দুধে আলতা মেশানো।

তৃতীয়ার মেঘ কালো চুল পিঠময় ছড়ান। চোখজোড়া কাটাকাটি আর চিবুকের ওপর একটা মস্ত বড় তিল।।

জুতোবিহীন তিনজোড়া পা সমতালে মাটিতে ফেলছিলো তারা আর এগিয়ে আসছিলো নগ্ন পায়ে শিশির মেখে মেখে।

ওরা ছিলো তিনজন।

রানু, বেনু আর নীলা।

রানু বললো, আপা, কেমন লাগছে রে?

নীলা মুখ তুলে তাকালো, কি?

এই খালি পায়ে হাঁটতে?

কেন, জীবনে কি প্রথম খালি পায়ে হাঁটছো নাকি?

না। তবে রাস্তায় এই প্রথম।

বেনু সহসা হেসে উঠলো। ওদের কথায়। বললো, আমার কিন্তু বেশ লাগছে। ওপাশ থেকে তখন আরো একটি মেয়ে এগিয়ে আসছিলো মেডিকেল কলেজের দিকে। তার গায়ের এ্যাপ্রন আর হাতের স্টেথোস্কোপ খানা দেখে সহজে অনুমান করা যাচ্ছিলো যে, সে ডাক্তারী পড়ে। অন্যদিন তার পায়ে এক জোড়া সুন্দর স্যান্ডেল পরানো থাকতো। আজ সেও নগ্ন পায়ে। চলনে তার জড়তা নেই। ক্লান্তি নেই। দৃঢ় পদক্ষেপ।

কাছে আসতে নীলা মিষ্টি হেসে বললো, কি সালমা যে, ক্লাশে যাচ্ছ বুঝি? তারপর তার নগ্ন পা জোড়ার দিকে চোখ পড়তে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সে, তুমিও তাহলে, বেশ বেশ।

হ্যাঁ, আমি। আমিও তোমাদের দলে। সালমা শান্ত গলায় জবাব দিলো। বেনু বললো, তা◌েমাদের আর সবাই, ওরাও খালি পায়ে হাঁটছে তো?

হ্যাঁ।

ইডেন কলেজের ওরা?

ওরাও খালি পায়ে।

কামরুন্নেছা?

হ্যাঁ, ওরাও।

সহসা কি এক আনন্দে চার জোড়া চোখ চিকচিক করে উঠলো।

রানু বললো, সত্যি কি মজা না?

তার কথায় আবার মৃদু হেসে উঠলো নীলা। হাসতে গেলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। ছিঁট-ফোঁটার মত ব্রণের দাগ ছড়ানো মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে পরক্ষণে আবার শুভ্রতায় ফিরে আসে।

পেছনে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে নীলা বললো, আচ্ছা আমরা এবার চলি সালমা। চলতে গিয়ে কি ভেবে আবার থেমে পড়লো। একা একা যাচ্ছে যে, পুলিশের ভয় নেই?

ভয়? ভ্রূজোড়া অস্বাভাবিকভাবে বাঁকা হয়ে এলো তার! ঠোঁটের কোণে ঈষৎ কাঁপন জাগলো। নীলার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে চাপা অথচ তীব্র গলায় বললো, ভয়, বলতে গিয়ে দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বেরুলো? তার, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলো সালমা।

আশ্চর্য শান্ত গলায় বললো, আমার স্বামী জেলে। ভাই জেলে। ছোট বোনটিও আমার জেলখানায়, আমার ভয় করার মত কিছু আছে?

তিনটি মেয়ে। তিনটি নারী হৃদয়। মুহূর্তে মোচড় দিয়ে উঠলো।

সালমার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না ওরা। গুমোট ভাবটা কেটে গেলে নীলা আস্তে করে বললো, চলো। গলা থেকে ফাটা বাঁশের মত আওয়াজ বেরুলো তার।

বেনু বললো, কি আশ্চর্য।

রানুর চোখে তখনো বিস্ময়। সে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে এলো নীলার দিকে। বেনুর দিকে।

তারপর।

রানু, বেনু আর নীলা। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করলো।

কিছুদূরে এসে রানু প্রথম কথা বললো। আপা, যা বলে গেলো সব সত্যি?

কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো নীলা।

বেনু কিছু বললো না। সে বোবা হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সবুরের সঙ্গে কথা বলছিলো মুনিম। ছেলেটা একটা বদ্ধ পাগল। কি যে সব বকে বোঝা ভার। বলে, এসব কিছু হবে না মুনিম ভাই, প্রয়োজন একটা আঘাত। সে আঘাত না দিতে পারলে কিছু হবে না। বলে হাসে সবুর। বদ্ধ পাগলের মত হাসে। মুনিম সরে গিয়ে পকেট থেকে এক আনা পয়সা বের করে সিগারেট কিনলো। তারপর পাশে ঝুলানো দড়ি থেকে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো সে।

সবুরের চোখ পড়লো মেয়ে তিনটির দিকে। চোখ পড়তেই মুখখানা বিকৃত করে অন্য দিকে সরিয়ে নিলো সে।

মেয়েরা ওর ভাবভঙ্গী দেখে হেসে উঠলো।

মুনিম বললো, কি ব্যাপার মুখটা অমন করলে কেন?

ওই মেয়েগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না বলে।

কেন, ওরা আবার কি করলো তোমার?

আমার আবার কি করবে। সবুর মুখখানা প্যাঁচার মতো করে বললো, ওদের দিয়ে কোন কাজ হয় কোনদিন? আজ পর্যন্ত একটা আন্দোলনে ওদের আসতে দেখেছে? এখন তো খালি পায়ে হেঁটে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে। একটা পুলিশ আসুক, দেখবে তিনজন একসঙ্গে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

কি যা তা বকছো? মুনিম ধমকে উঠলো। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। সবুর তবু থামলো না। যাই বল তুমি, ও মেয়েগুলোকে দিয়ে কিছু হবে না। এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

তুমি একটা বদ্ধ পাগল। বলে ফিক করে হেসে দিলো মুনিম।

আধপোড়া সিগারেটটা সবুরের দিকে এগিয়ে দিলো। নাও টানো। বলে দ্রুত পায়ে মধুর রেস্তোরার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

আমগাছতলায় একদল ছাত্র জটলা করে এতক্ষণ কি যেন আলাপ করছিলো। মুনিমকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো ওকে।

একজন বললো, পোস্টারগুলো কোথায় লাগাবা মুনিম ভাই? প্রক্টার সাহেব বড় বেশি গোলমাল শুরু করেছেন। বলছেন, এখানেও লাগাতে দেবেন না। আরেকজন বললো, দেয়াল পত্রিকার কি খবর মুনিম ভাই, ওটা লিখতে দিয়েছেন?

তৃতীয় জন বললো, ব্যাপার কি? লিফলেটগুলো এখনো এসে পৌছলো না প্রেস থেকে?

একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন।

পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখ মুছলো মুনিম। সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললো, সব হবে, এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন তোমরা?

কিন্তু পোস্টারগুলো?

হ্যাঁ, ওগুলো আমাদের ইউনিয়ন অফিসের দেয়ালে সেঁটে দাও। তারপর একটা ছেলের দিকে তাকালো মুনিম। এই যে রাহাত, তুমি আমার সঙ্গে এসো। একটু প্রেস থেকে ঘুরে আসি। দেখি লিফলেটগুলোর কি হলো।

ক্লাশে মন বসছিলো না সালমার।

প্রফেসর নার্ভাস সিসটেমের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর সে ভাবছিলো তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা।

মাঝে মাঝে এমনি হয় তার। মনটা খারাপ থাকলে অথবা কোনো আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালে, কোন মিছিল দেখলে, কোন সভা-সমিতিতে গেলে, স্বামীর কথা মনে পড়ে। বড় বেশি মনে পড়ে তখন। কে জানে এখন কেমন আছে রওশন।

মাসখানেক আগে শেষ চিঠি পেয়েছিলো তার। তারপর আর কোন চিঠি আসেনি। আগে নিজ হাতে লিখতো। কি সুন্দর হাতের লেখা ছিলো তার। আজকাল অন্যের হাতে লেখায়।

হাতের কথা মনে হতে মুখখানা ব্যথায় লাল হয়ে এলো তার। দু'খানা হাতই হারিয়েছে রওশন।

একখানাও যদি থাকতো। প্রথমে কিছুই জানতো না সালমা। শুনেছিলো রাজশাহী জেলে গুলি চলেছে। শুনে আর্তচিৎকারে কিংবা গভীর কান্নায় ফেটে পড়ে নি সে। বোবা দৃষ্টি মেলে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েছিলো। মুহুর্তের জন্য চারপাশের এই সচল পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল ভুলে গিয়ে, জানালার দুটো শিক দুহাতে ধরে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলো সে। বুকের ঠিক মাঝখানটায় আশ্চর্য এক শূন্যতা।

হয়তো মারা গেছে। রওশন।

পরে শুনলো মরে নি। ভালো আছে সে। সুস্থ আছে।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে রাজশাহী জেলে রওশনের সঙ্গে দেখা করতে যায় সালমা। জেল অফিসের সেই ঘরে সেদিন সহসা যেন মাথায় বাজ পড়েছিলো সালমার। যে বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করতো সে দুটো হাত হারিয়েছে রওশন। শার্টের হাতজোড়া শুধু ঝুলে আছে কাঁধের দু'পাশে।

সালমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেছিলো রওশন। তাই ক্ষণিকের জন্যে সেও কেমন উন্মনা হয়ে পড়েছিলো। সেই প্রথম অতি কষ্টে, বাঁধ ভেঙ্গে আসা কান্নাকে সংযত করলো সালমা। আস্তে করে শুধালো, কেমন আছো?

শূন্য হাতজোড়া সামান্য নড়ে উঠলো। ঠোঁট কাঁপলো। রওশন মৃদু গলায় জবাব দিলো, ভালো।

নিজেকে বড় বিপন্ন মনে হলো সালমার, মনে হলো শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। বুকের নিচে একটা চিনচিনে ব্যথা। সালমা সহসা প্রশ্ন করে বসলো, খাও দাও কেমন করে? বলে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলো সে। মুখের রঙ হলদে থেকে নীলে বদল হলো।

চোখজোড়া, অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে রওশন ইতস্তত করে জবাব দিলো, বন্ধুরা খাইয়ে দেয়। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এসেছিলো তাঁর। আর সালমার চোখে টলটল করে উঠেছিলো দু'ফোটা পানি।

ভাত না হয় বন্ধুরা খাইয়ে দেয়। কিন্তু কেমন করে বিড়ির ছাই ফেলে সে? কেমন করে বইয়ের পাতা উল্টোয়? কেমন করে জামা-কাপড় পরে? ভাবতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিলো তার। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ তুলে শুধালো, দু'হাতেই কি গুলি লেগেছিলো?

হ্যাঁ। রওশন জবাব দিলো, আর কয়েক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই এ জন্মে আর দেখা পেতে না। সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো রওশন।

অপরিসর সেই ঘরের চার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে সে হাসি তীরের ফলার মত এসে বিঁধলো সালমার কানে।

সালমা শিউরে উঠলো। লোকটা কি পাগল হয়ে গেলো নাকি?

শূন্য হাতজোড়া তখনো কাঁপছে হাসির ধমকে।

রওশনের সঙ্গে সালমার প্রথম আলাপ হয়েছিলো এক শাওন ঘন রাতে, ঢাকাতে ওদের টিকাটুলীর বাসায়। তখন সালমা স্কুলে পড়তো। বয়সে আরো অনেক ছোট ছিলো। তখন আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। গ্রেফতার করে কয়েকশো লোককে আটক করা হয়েছে জেলখানায়। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে।

রওশনের নামেও পরোয়ানা বেরিয়েছিলো। আর তাই, আজ এখানে, কাল সেখানে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো সে।

একদিন শাওন রাতে রিমঝিম বৃষ্টি ঝরছিলো। দাদার সঙ্গে রওশন এলো ওদের বাসায়।

বৃষ্টিতে গায়ের কাপড় ভিজে গিয়েছিলো।

গামছায় গা মুছে নিয়ে দাদা ডাকলেন, সালমা শুনে যা।

এই আসি, বলে দাদার ঘরে এসে রওশনকে দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলো সালমা।

লম্বা গড়ন। উজ্জ্বল রঙ। তীক্ষ্ণ চেহারা। দাদা পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার বন্ধু রওশন। আর এ আমার বোন সালমা। ক্লাশ নাইনে পড়ে। সালমা হাত তুলে আদাব জানালো তাকে।

রওশন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কোন স্কুলে পড়ছো?

কামরুন্নেছায়।

দাদা বললেন, মাসখানেক ও এখানে থাকবে সালমা। ওর দেখাশোনার ভার কিন্তু তোমার ওপর।

মাসখানেকের জন্যে ওর ভার নিয়েছিলো সালমা।

জীবনের জন্যে নিতে হবে কে জানতো?

ক্লাশ শেষে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পুরনো দিনের স্মৃতিটা যেন স্বপ্নের মত মনে হলো ওর।

শহরের এ অংশটা পুরানো আর ভাঙ্গাচোরা। বাড়িগুলো সব একটার সঙ্গে আরেকটা একেবারে ঠাসা। দরজাগুলো সব এত ছোট যে, ভেতরে যেতে হলে উপুর হয়ে ঢুকতে হয়। রাস্তাগুলো খুব সরু সরু। অনেক জায়গায় এত সরু যে পাশাপাশি একটার বেশি দুটো রিকশা যেতে পারে না। এমনি একটা সরু রাস্তার ওপরে মতি ভাইয়ের ছোট রেস্তোরা।

সকাল থেকে মনটা আজ কেমন উন্মুখ হয়ে পড়ে আছে তার। কাউন্টারে বসে এতক্ষণ ফজলুর সঙ্গে তর্ক করছিলো সে।

ফজলু বলছিলো, আমি নিজ কানে শুনে এলাম, করাচীতে কোন এক মন্ত্রী মারা গেছে, তার জন্য খালি পায়ে হেঁটে শোক করছে ওরা।

আর তুমি বলছো মিথ্যে কথা?

তুমি একটা আস্ত উল্লুক। মাতি ভাই গাল দিয়ে উঠলো। মন্ত্রীর জন্যে শোক করতে ওদের বয়ে গেছে। আসলে অন্য কোন কারণ আছে।

আমার তো মনে কেমন ধাঁ ধাঁ লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে। আর জানো? কাল রাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। মনে আছে, সেবারো আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই সেবার। মনে পড়ছে না তোমার? উহ্। সে এক জামানা গেছে ভাই। আমার তো মনে হয়েছিলো দুনিয়াটা বুঝি ফানাহ হয়ে যাবে। চারদিকে শুধু হরতাল আর হরতাল। ইউনিভারসিটির ছাত্ররা। মেডিকেল কলেজ। সেক্রেটারিয়েট। হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি। ব্রিক ওয়ার্কস। রেলওয়ে। সব হিসেব দিয়ে কি আর শেষ করা যায়? তাই মিছিলের তো অন্ত ছিলো না। এ গলি দিয়ে একটা বেরুচ্ছে, ও গলি দিয়ে আরেকটা। সবার হাতে বড় বড় সব প্লাকার্ড। তাতে লাল কালিতে লেখা খুনীরা সব গদি ছাড়। সে এক জমানা গেছে ভাই। একটানা কথা বলতে গিয়ে ঘামিয়ে উঠলো মতি ভাই। কোলের উপর থেকে গামছাখানা তুলে নিয়ে গায়ের ঘাম মুছলো সে। তারপর সামনে ঝুকে পড়ে বললো, জানো? এই যে বসে আমি, এখান থেকে বিশ হাত দূরে, ওই-ওইযে ল্যাম্পপেস্টটা দেখতে পাচ্ছে, ওটার নিচে গুলি খেয়ে মারা গেলো আমাদের আমেনার বার বছরের বাচ্চা ছেলেটা।

ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো ওখানটায়। পুলিশ দেখে, কি যে বলবো, ভাই, এতটুকুন বাচ্চার যে কি সাহস। চিৎকার করে বললো, জুলুমবাজ ধ্বংস হোক।

মতি ভাই যখন কথা বলছিলো ঠিক তখন চা খাবে বলে রেস্তোরায় এসে ঢুকলো মুনিম আর রাহাত। মতি ভাই তাকিয়ে দেখলো ওদের পা জোড়া নগ্ন। দেখে খুশীতে নড়েচড়ে বসলো সে। এবার ওদের জিজ্ঞেস করে আসল খবর জেনে নিতে পারবে। সকালে অবশ্য একটা ছেলেকে মতি ভাই পাঠিয়েছিলো মা েড়ে যে মেয়েদের স্কুল আছে সেখান থেকে খবর আনতে। কিন্তু, মেয়েরা

নাকি গালাগালি করে তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। বলেছে, অমন ছেড়া কাপড় পরে থাকলে কি হবে টিকটিকিদের আমরা ভালো করে চিনি। খবরদার এখানে যদি আবার আসো, তাহলে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো।

এটা ওদের বাড়াবাড়ি।

একজনকে না জেনেশুনে টিকটিকি বলা উচিত হয় নি ওদের। নিজের মনে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো মতি ভাই। কিন্তু দেশের যা অবস্থা হয়েছে ওদেরও বা কি দোষ। কে গোয়েন্দা আর কে ভদ্রলোক সেটা বুঝাই বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে। অদূরে বসা রাহাত আর মুনিমের দিকে বার কয়েক ফিরে তাকালো মতি ভাই। চা খাচ্ছে আর চাপা গলায় কি যেন আলাপ করছে। মতি ভাইয়ের ভীষণ ইচ্ছে হলো ওরা কি বলছে শুনতে। কিন্তু, সাহস হলো না তার। কে জানে, যদি ছেলে দুটো আবার তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে বসে। কিম্বা এমন তো হতে পারে যে ছেলে দুটোই গোয়েন্দার লোক। আজকাল তো এসব হরদম হচ্ছে !

একটু পরে চা কাউন্টারে পয়সা দিতে এলো মুনিম।

মতি ভাই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনারা সবাই আজ খালি পায়ে হাঁটছেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুনিম। আর রাহাত পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে মতি ভাইকে কি যেন বললো মুনিম। শুনে মুখটা আনন্দে চিকচিক করে উঠলো তার। তাহলে সে যা আঁচ করেছিলো তাই।

পয়সা দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিলো। মতি ভাই পেছন থেকে ডাকলো ওদের। ডেকে পয়সাগুলো ফিরিয়ে দিলো হাতে।

মুনিম অবাক হলো। কি ব্যাপার, এগুলো অচল নাকি?

না। অচল হতে যাবে কেন? মতি ভাই লজ্জিত হলো, চায়ের পয়সা দিতে হবে না, যান।

সেকি কথা, জোর করে পয়সাগুলো হাতে গুজে দিতে চাইলো মুনিম।

মতি ভাই তবু নিলো না।

রাস্তায় নেবে রাহাতকে বিদায় দিলো মুনিম। বললো, তোমার আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। তুমি যাও। লিফলেটগুলো প্রেস থেকে নিয়ে আমি একটু পরেই আসছি। তুমি আসাদকে গিয়ে বলো, নীরার সঙ্গে দেখা করে ও যেন দেয়াল পত্রিকাগুলো নিয়ে আলাপ করে।

রাহাত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো, তারপর ধীরে ধীরে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলো মুনিম। এটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। এ নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে। ও হাসে। কিছু বলে না। রুমালটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল মুনিম। এখান থেকে সোজা প্রেসে যাবে কিনা ভাবলো। ভাবতে গেলে কপালে ভাঁজ পড়ে ওর। মুখখানা সূঁচালো হয়ে আসে। চোখজোড়া নেমে আসে মাটিতে।

মুনিম ভাবছিলো। এমনি সময়ে একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তার ওপাশ থেকে ছুটে এসে হাত চেপে ধরলো ওর। মুনিম ভাই, আপনাকে আপা ডাকছে।

আরে, মিন্টু যে! তুমি এখানে?

আপনাকে আপা ডাকছে।

ও। হঠাৎ মুনিমের খেয়াল হলো, তাইতো, ডলিদের বাসার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এতক্ষণ কোন খেয়াল ছিলো না। নিজের এই অন্যমনস্কতার জন্যে রীতিমত অবাক হলো মুনিম। একটু ইতস্তত করে বললো, এখন আমি খুব ব্যস্ত, বুঝলে মিন্টু, তোমার আপাকে গিয়ে বলো, পরে আসবো।

না। তাহলে আপা আমায় বকবে। ওইতো উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। চলুন না। মিন্টু একেবারে নাছোড়বান্দা।

ওকে অনেক করে বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হলো মুনিম।

চোখজোড়া বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করছিলো ডলির।

মুখটা লাল হয়ে উঠেছিলো রাগে। দোরগোড়ায় পৌছতে বললো, না এলেই তো পারতে।

আসতে তো চাইনি। জোর করে নিয়ে এলো।

তাইতো বলছি, এলে কেন, চলে যাও না।

আহ বাঁচালে তুমি। বলে চলে যেতে উদ্যত হলো মুনিম।

পেছন থেকে চাপা গলায় ডলি চিৎকার করে উঠলো। যাচ্ছ কোথায়?

কেন, তুমি যে যেতে বললে।

না। ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

ডলির পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলো মুনিম।

বাসাটা বেশ বড় ডালিদের। সামনে যত্ন করে লাগানো বাগান। পেছনে একটা ছোট টেনিস কোর্ট, সামনের গোল বারান্দাটা পেরোলে সাজানো বৈঠকখানা। পাশের ঘরটা খালি। তারপর চাকরীদের থাকবার কামরা। নিচে ওরা কেউ থাকে না। থাকে দোতলায়।

মুনিমকে ওর ঘরে বসিয়ে, আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো ডলি। বললো, তুমি বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।

আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারবো না। পরক্ষণে জবাব দিলো মুনিম।

ডলি তখন চলে গেছে। এ ঘর মুনিমের অনেক পরিচিত। বহুবার এখানে এসেছে সে। বসেছে। ঘন্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে ডলির সঙ্গে।

একটা খাট। খাটের পাশে ডলির পড়বার ডেস্ক। একখানা চেয়ার! ডান কোণে একটা তাকের ওপর যত্ন করে সাজানো কয়েকটা বই। গল্প। উপন্যাস।

ওর মধ্যে একখানা বইয়ের ওপর চোখ পড়তে এক টুকরো স্নিগ্ধ হাসির আভা ঢেউ খেলে গেলো। ওর ঠোঁটের কোণে। ও বইটা ডলিকে উপহার দিয়েছিলো মুনিম।

ডলিকে প্রথম দেখেছিলো মুনিম দীর্ঘ ছ'বছর আগে। দেশ বিভাগের পরে তখন সবে নতুন ঢাকায় এসেছে সে। বাবা-মা তখনো কোলকাতায়। ঢাকায় এসে জাহানারাদের বাসায় উঠেছিলো মুনিম। সম্পর্কে জাহানারা ফুফাত বোন। স্বামী-স্ত্রীতে ওরা মিটফোর্ডের ওখানে থাকত। পাশাপাশি দু'টো কামরা। একটা পাকঘর আর সরু একফালি বারান্দা। সপ্তাহ খানেক থাকবে বলে এসেছিলো মুনিম। কিন্তু জাহানারা ছাড়লো না, বললো, কোনোদিন আসবে তা ভাবি নি। এসেছো যখন দিন পনেরো না থেকে যেতে পারবে না। পাগল হয়েছে। সাতদিনের বেশি থাকলে মা-বাবা ভীষণ রাগ করবেন। মুনিম জবাব দিয়েছিলো। সামনের বার এলে পনেরো দিন কেন, মাস খানেক থাকবো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিন পনেরো থাকতে হয়েছিলো তাকে। কোলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন ডলিকে প্রথম দেখলে সে। হাল্কা দেহ, ক্ষীণ কটি, কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লেগে গিয়েছিলো মুনিমের। ডলিরা তখন ও পাড়াতেই থাকতো।

জাহানারার সঙ্গে আলাপ ছিলো বলে বাসায় মাঝে মাঝে আসতো ডলি। তীক্ষ্ণ নাক। পাতলা চিবুক। সরু ঠোঁটের নিচে একসার ইঁদুরের দাঁত। ভেতরের ঘরে বসে জাহানারার সঙ্গে গল্প করছিলো সে। পর্দার এপাশ থেকে ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল মুনিম। আর, পরদিন ওকে কোলকাতায় চলে যেতে হবে ভেবে মনটা কেন যেন সেদিন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।

বছর খানেক পরে ওরা যখন কোলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকাতে চলে এলো, ডলিরা তখন চাটগাঁ-এ। খোঁজটা জাহানারার কাছ থেকে পেয়েছিলো

মুনিম। জাহানারা প্রশ্ন করলো, হঠাৎ ডালির খোঁজ করছো, ব্যাপার কি? যতদূর জানি, ওর সাথে তো তোমার কোন পরিচয় ছিলো না।

মুনিম ঢোক গিলে বললো, না এমনি। সেবার তোমাদের এখানে দেখেছিলাম কিনা, তাই।

জাহানারা মুখ টিপে হাসলো। তাই বলো।

তারপর থেকে ডলির কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলো মুনিম। মাঝে মাঝে যে মনে হতো না তা নয়। তবে সে মনে হওয়ার মধ্যে প্রাণের তেমন সাড়া ছিলো না।

তখন প্রথম বর্ষের পাঠ চুকিয়ে দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সে পড়ছে মুনিম। এমনি সময়, একদিন বিকেলে জাহানারাদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে ডলিকে আবিষ্কার করলো সে।

টেবিলে বসে চা খাচ্ছিলো ওরা।

ওকে দেখে জাহানারা মৃদু হাসলো, মুনিম যে এসো। তারপর ডলির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম ডলি।

ডলি আরক্ত হয়ে তাকালো ওর দিকে।

তারপর আদাব জানিয়ে বললো, জাহানারার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

তাই নাকি? খুব সহজভাবে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ শুরু হলো মুনিমের। একগাল হেসে বললো, আমিও আপনার কথা অনেক শুনেছি। ওর কাছ থেকে।

কি শুনেছেন? চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে এনে আবার নামিয়ে রাখলো ডলি।

মুনিম বললো, আপনি যা শুনেছেন তাই।

উত্তরটা শুনে নিরাশ হয়েছিলো ডলি। কিন্তু নির্বাক হয় নি। মাঝে মাঝে দেখা হলে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতো ওর সঙ্গে। কখনো শহরের সেরা

ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা চলতো। কখনো শেক্সপীয়রের নাটক কিংবা শেলীর কবিতা। প্রথম প্রথম এ আলোচনা ক্ষণায়ু হতো, পরে দীর্ঘায়ু হতে শুরু করলো।

একদিন দুপুরে ওকে একা পেয়ে জাহানারা অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা মুনিম, ডলিকে তোমার কেমন লাগে?

সহসা কোন উত্তর দিতে পারলো না মুনিম। ইতস্তত করে বললো, মন্দ না, বেশ ভালই তো। শেষের কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল সে। জাহানারা মুখ টিপে হাসলো, হুঁ, এই ব্যাপার।

কেন, কি হয়েছে? পরীক্ষণে প্রশ্ন করলো মুনিম।

না। এমনি। তা তুমি অমন লাল হচ্ছে কেন। এতে আবার লজ্জার কি হলো। এবার শব্দ করে হেসে দিলো জাহানারা। আমি সব জানি তো, ডলি আমাকে সব বলেছে।

হাতমুখ ধুয়ে এ ঘরে-ফিরে এসে ডলি দেখলো তাকের উপরে রাখা বইগুলো ঘাটছে মুমিন।

কি খুঁজছে? ডলি শুধালো।

কিছু না। একটা বই হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুনিম। বাড়ির চাকরাটা দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে চলে গেলো। তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডলি। অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি করে বললো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসে।

বইটা তাকের ওপর রেখে দিয়ে মুনিম আস্তে করে বললো, না, এবার চলি। না। মুহুর্তে খোলা দরজাটার সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো ডলি।

পাগলামো করো না। আমার এখন অনেক কাজ?

কি কাজ? জান তো সব। তবু আবার জিজ্ঞেস করো কেন?

না এমনি। কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে পেঁচাতে পেঁচাতে মৃদু গলায় জবাব দিলো ডলি। তার মুখখানা ম্লান আর বিবর্ণ। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো সে, আজ আমার জন্মদিন।

জন্মদিন! তইতো, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

কোনদিন হয়তো আমাকেই ভুলে যাবে। অদ্ভুত গলায় জবাব দিল ডলি।

মুনিম ইতস্তত করে বললো, কি যা-তা বলছো ডলি।

ডলি মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুনিমের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্ষণকাল। ওর মুখে কি যেন খুঁজলো তারপর বললো, তুমি দিনে দিনে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।

বদলে যাচ্ছি! পরিবর্তনটা কোথায় দেখলে তুমি?

তোমার ব্যবহারে।

যেমন-।

নিজে বুঝতে পারো না? ওটা কি উদাহরণ দিয়ে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? অত্যন্ত পরিষ্কার গলায় টেনে টেনে কথাগুলো বললো ডলি।

মুনিম নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে একটা উত্তর খুঁজছিলো সে। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বললো, চলি। এবার আর বাধা দিলো না ডলি। বিষন্ন মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেলো সে। আজ বিকেলে আসছো তো?

হ্যাঁ। আসবো।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু পরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মুনিম। দুপুরের দিকে রোদ খুব কড়া হয়ে উঠলো। বাতাস না থাকায় রোদের মাত্রা আরো তীব্রভাবে অনুভূত হলো। মনে হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা যেন অর্ধেক কমে গেছে।

ভিকটোরিয়া পার্কের পাশে তার শোবার ঘর খানায় বজলে হোসেন গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। একটা কবিতা কি একটা গল্প যে লিখবে তাও মন বসছে না। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ছিলো তিনটে। দুটো অনার্স, এটা সাবসিডিয়ারি। ওর বড়ো দুঃখ হলো যে আজ তিনটে পার্সেন্টেজ নষ্ট হলো। শুধু আজ নয়, আসছে দুটো দিনেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবে না সে। কি করে যাবে? জুতো পায়ে দিয়ে গেলে যে ছেলেরা তাড়া করবে ওকে। অথচ জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাঁটার কথা ভাবতেও পারে না বজলে হোসেন। সত্যি খালি পায়ে ইউনিভারসিটিতে যাওয়া কি সম্ভব?

পাগল। যতসব পাগলামো। হঠাৎ উদ্যোক্তাদের গালাগাল দিতে ইচ্ছে করলো ওর। খেয়ে-দোয়ে কোন কাজ নেই। কি যে করে সরকার। এসব ছেলেদের ধরে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙ্গায় না কেন? গরমে গা জ্বালা করছিলো বজলে হোসেনের। বন্ধু মাহমুদকে আসতে দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বিছানা ছেড়ে উঠে বললো, মাহমুদ যে, এসো। কি খবর?

উত্তরে কাঁধটা বেশকায়দা করে ঝাঁকলো মাহমুদ। তারপর সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম, তোমাকে এক নজর দেখে যাই। কি ব্যাপার, আজ বেরোও নি?

বজলে মাথা নাড়লো, না।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে মাহমুদ কি যেন ভাবতে লাগলো। গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করে সে। এককালে কবিতা লেখার বাতিক ছিলো খুব।

সেই সূত্রে বজলের সঙ্গে আলাপ। এখন আর লেখে না। একা থাকে শহরে। মা আর ছোট এক বোন আছে, তারা দেশের বাড়িতে।

একটুকাল পরে বজলে প্রশ্ন করলো, এদিকে কোথায় আসছিলে?

মাহমুদ জবাব দিলো, একটা প্রেসে।

প্রেসে?

হ্যাঁ।

প্রেসে কি কাজ তোমার? বজলে অবাক হলো। তারপর সোৎসাহে বললো, কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছ বুঝি? চমৎকার! কনগ্রেচুলেশন মাহমুদ। আমি বলি নি, তুমি ওই চাকরিটার মাথা খেয়ে আবার কবিতা লিখতে শুরু করে দাও। অন্ন গড় বলছি তুমি খুব সাইন করবে।

ওর কথা শুনে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো মাহমুদ। বললো, তোমাদের ছাত্ররা নাকি এখানে একটা প্রেসে লিফলেট ছাপতে দিয়েছে।

খবর পেয়ে খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

নুইসেন্স। ধাপ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো বজলে। তোমাদের সবাইকে ওই একই ভূতে পেয়েছে। খানিকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে অন্য মনস্কভাবে বললো, কিছু পেলে?

না, মাহমুদ একটা লম্বা হাই তুললো। ভার্সিটির খবর কি?

বজলে সংক্ষেপে বললো। জানি না। আমি যাই নি। তারপর কি মনে হতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে। টেবিলের ওপর থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে আবার বললো, কাল রাতে হঠাৎ একটা দীর্ঘ কবিতার জন্ম দিয়েছি। দেখ তো কেমন হয়েছে। বলে কবিতাটা টেনে টেনে আবৃত্তি করে তাকে শোনাতে লাগলো বজলে হোসেন।

কলতাবাজারে ওদের ছোট বাসা বাড়িটায় যখন ফিরে এল সালমা তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারপাশে। স্বচ্ছ নীলাকাশে একটি দুটি করে তারা জ্বলতে শুরু করেছে।

কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুলো সালমা। আলনা থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে মুখ-হাত মুছলো। তারপর জানালার কবাট দুটো খুলে কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে দাঁড়ালো সে।

এমনি সময় যখন পুরো শহরটা আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

এখানে সেখানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত টিমটিমে আলো, কোথাও-বা হালকা নীল ধোঁয়া সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

কোথাও কোন শাশুড়ি তার বউকে গালাগালি দিচ্ছে, বাচ্চা ছেলেরা সুর করে পড়ছে কোন ছড়ার বই কিম্বা কোন ছন্দোবদ্ধ কবিতা, তখন এমনি জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগে সালমার।

উত্তর থেকে ভেসে আসা হিমেল বাতাসে বসন্তের ঘ্রাণ।

এ মুহুর্তে রওশন যদি থাকতো পাশে।

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো সালমা।

আজ কত দিন হয়ে গেছে, দিন নয়, বছর। কত বছর।

বিয়ের মাস খানেক পরে ধরা পড়েছিল রওশন।

দাদাসহ কোথায় যেন বেরিয়েছিলো ওরা, সন্ধ্যার পরে। দু'জনের কেউ আর ফিরে আসে নি। ভাত সাজিয়ে সারা রাত জেগেছিলো সালমা। পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে শুনলো লালবাগে পুলিশের হেফাজতে আছে ওরা।

জানালার পাশ থেকে সরে এসে বিছানার নিচে রাখা একটা টিনের সুটকেস, টেনে বের করলো সালমা। রওশনের পুরনো চিঠিগুলো একে একে বের করে দেখলে সে।

জানো সালমা,

কাল মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো আমার। বাইরে তখন অবিরাম বৃষ্টি ঝরছিলো। আর সেই বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে জানি না। কখন মনটা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়েছিলো। আর সেই মুহুর্তে আকাশ ছোঁয়া চার দেয়ালের বাঁধন ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম আমি।

মনে হলো, আমার সেই গ্রামের বাড়িতে বুড়ো দাদীর কোলে মাথা রেখে রূপকথার গল্প শুনছি।

বাইরে এমনি বৃষ্টি ঝরছে। আর আমি দু'চোখে অফুরন্ত কৌতুহল নিয়ে শুনছি, কেমন করে সেই কদাকার রাক্ষসটা ছলনা চাতুরী আর মুক্তির তাণ্ডব মেলিয়ে কুঁচবরণ কন্যার স্নেহমাখা আলিঙ্গন থেকে তার অতি আদরের রাজকুমারকে নিয়ে গিয়ে আটক রাখলো পাথরের নিচে।

তারপর আর চিঠিখানা পড়তে পারলো না সালমা। সেন্সারের নিখুঁত কালো কালির আড়ালে পরের অংশটুকু চাপা পড়ে গেছে।

ওটা রেখে দিয়ে আরেকখানা চিঠি খুললো সালমা।

আরেকখানা।

আরো একখান।

তারপর দুয়ারে কে যেন কড়া নাড়লো।

টিনের সুটকেসটা বন্ধ করে রেখে এসে দরজাটা খুললো সালমা।

বড় চাচা এসেছেন।

সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। পরনে পায়জামা আর শার্ট। হাতে একটা ছাতা। সালমা জানতো চাচা আজ আসবেন।

ছাতাটা একপাশে রেখে দিয়ে কোন রকম ভূমিকা না করেই চাচা বললেন, শোনো, আগামী দু'তিন দিন রাস্তাঘাটে বেরিয়ো না। আমার শরীর খারাপ, গায়ে জ্বর নিয়ে এসেছি। জানি আমার কথার কোন দাম দিবে না তোমরা। আজকালকার ছেলেপিলে তোমরা বুড়োদের বোকা ভাবো। তবু না এসে থাকতে পারলাম না। শোনো, একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে এবার, এই আমি বলে রাখলাম।

আপনাকে এক কাপ চা করে দিই? ওর কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা যতি টানার চেষ্টা করলো সালমা।

চাচা থেমে গিয়ে বললেন, ঘরে আদা আছে?

আছে।

তাহলে একটু আদা মিশিয়ে দিও।

আচ্ছা। খাটের নিচের স্টোভটা টেনে নিয়ে চা তৈরি করতে বসলো সালমা। মাঝে মাঝে রওশনকেও এমনি চা বানিয়ে খাওয়াতো সে।

একদিন নিজের হাতে স্টোভ ধারাতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছিলো রওশন। সালমা পোড়া জায়গায় মলম লাগিয়ে দিতে শাসনের ভঙ্গীতে বলেছিলো, খবরদার, আর স্টোভের ধারে পাশেও আসতে পারবে না তুমি।

কি করবো বলো, কিছু করার জন্যে হাতজোড়া সব সময় নিসপিস করে।

মুহূর্তের জন্যে সালমার মনে হলো যেন হাতজোড়া আগের মত আছে। রওশনের, বলিষ্ঠ একজোড়া হাত।

না, আর কোনদিনও সে আলিঙ্গন করতে পারবে না।

স্টোভের ওপর চায়ের কেতলিটা ধীরে ধীরে তুলে দিলো সালমা।

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, রওশনের কোন চিঠি পেয়েছে?

সালমা আস্তে করে বললো, হ্যাঁ।

চাচা সে কথা শুনলেন। কিনা বোঝা গেলো না। তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন, কি হবে এসব করে। এতো করে বলি ছেড়ে দে বাবা, ওসব আমাদের ঘরের ছেলেদের পোষায় না। ও হচ্ছে বড়লোকদের কাজ যাদের কাড়ি কাড়ি টাকা আছে। সারা দুনিয়ার লোকে লুটেপুটে খাচ্ছে। ঘর করছে। বাড়ি করছে। জমিজমা করছে। আর ওনারা শুধু জেল খেটেই চলেছেন। দেশ উদ্ধার করবে। বলি, দেশ কি তোমাদের জন্যে বসে রয়েছে? সবাই নিজের নিজেরটা সামলে নিচ্ছে। তোরা কেন বাবা মাঝখানে নিজের জীবনটা শেষ করছিস? না, এসব পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি রওশনকে কড়া করে একখানা চিঠি লিখে দাও সে যেন বন্ড দিয়ে চলে আসে। নিজের ঘর সংসার উচ্ছনে গেলো, দেশ নিয়ে মরছে। হ্যাঁ, তুমি ওকে চিঠি লিখে দাও ও যদি বন্ড সই করে না আসে তাহলে আমরা কোর্টে গিয়ে তালাকের দরখাস্ত করবো। হ্যাঁ, তোমার বাবা

বেঁচে থাকলেও তাই করতেন। বড়চাচা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরীক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। গলাটা একেবারে নিজের পর্দায় নামিয়ে এনে বললেন, আমি তোমাদের ভালো চাই বলেই বলছি নবইলে বলতাম না।

সালমার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জ্বলন্ত স্টোভাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে। পাথরে মত নিশ্চল।

আজ নতুন নয় বহুদিন এ কথা বলেছেন চাচা। রওশনও চিঠি লিখেছে। আমার জন্যে তুমি নিজেকে শেষ করবে। কেন সালমা। আমি কবে বেরুবো জানি না। কখন ছাড়া পাবো জানি না। তুমি আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে। পরিষ্কার করে কিছু লেখে নি সে। লিখতে সাহস হয় নি হয়তো। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সালমা উঠে দাঁড়ালো। চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিলো বড় চাচার হাতে।

একটু পরে চা খাওয়া শেষ হলে আরো বার কয়েক সালমাকে সাবধান করে দিয়ে আর রওশনকে একখানা ঝাড়া চিঠি লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন বড় চাচা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাড়িয়ে রইলো সালমা। বড় ক্লান্তি লাগছে। তেইশ বছরের এই দেহটা তার যেন আজ মনে হলো অনেক বুড়িয়ে গেছে। হয়তো কিছু দিনের মধ্যে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। তখন অনেক অশ্রু ঝরিয়েও এ জীবনটাকে আর ফিরে পাবে না সে। ভাবতে গিয়ে সহসা কান্না পেলো সালমার। শাহেদের ডাকে চমক ভাঙলো। ভাত দে আপা, ক্ষিধে পেয়েছে। কি ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! দুলাভাইয়ের কথা?

সালমা শিউরে উঠলো। না, কিছু না। চলো ভাত খেতে যাবে। দরজার সামনে থেকে সরে গেলো সালমা।

ভাত খেয়ে উঠে শাহেদ বললো, ইয়ে হয়েছে আপা। আমি একটু বাইরে যাবো। ফিরতে দেরি হবে। তুই কিন্তু ঘুমোস নে।

আমার জেগে থাকতে বয়ে গেছে। সালমা রেগে গেলো। এখন বাইরে যেতে পারবে না তুমি।

কেন?

কেন মানে? এ রাত আটটায় বাইরে কি দরকার তোমার?

দরকার আছে।

কি দরকার?

বলতে পারবো না।

না বলতে পারলে যেতেও পারবে না।

বললাম তো দরকার আছে।

কি দরকার বলতে হবে।

সিনেমায় যাবো।

সিনেমায় যাবে তো রাত ন'টার শো কেন? দিনে যেতে পারো না? এখন পড়ো গিয়ে। দেখতে হলে কাল দিনে দেখো।

আজ শেষ শো, কাল চলে যাবে।

কি সিনেমা শুনি।

ন্যাকেড কুইন।

ন্যাকেড কুইন? সালমা অবাক হলো, ওটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে। তোমার মত বাচ্চা ছেলেদের জন্য নয়।

আমি বুঝি বাচ্চা? শাহেদ ক্ষেপে উঠলো। তোর চোখে তো আমি জীবনভর বাচ্চাই থেকে যাবো।

ছোট ভাইটিকে নিয়ে বড় বিপদ সালমার। একটুতে রাগ করে বসে। অন্যায় কিছু করতে গেলে বাধা দেবে সে উপায় নেই। মাঝে মাঝে বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে সালমা।

ওকে চুপ থাকতে দেখে শাহেদ আবার বললো, আমি চললাম, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা। বলেই যাবার উদ্যোগ করলো সে।

পেছন থেকে সালমা ডাকলো, যেয়ো না শাহেদ। শোন, বাচ্চা ছেলেদের ঢুকতে দিবে না ওখানে।

ইস দেবে না বললেই হলো। কত ঢুকলাম।

সালমার মুখে যেন একরাশ কালি ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো শাহেদ।

এমনি স্বভাব ওর।

ডলি তার ঘরে বসেছিল।

বজলে হোসেন বায়রনের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলো তাকে।

Let us have wine and the women
Mirth and laughter
Sermens and soda water the day
After.....

সম্পর্কে বজলে হোসেন মামাতো ভাই হয় ওর। যেমন লেখে তেমনি ভালো আবৃত্তি করতে পারে বজলে। তাই ওকে ভালো লাগে ডলির।

ও এলে বায়রন অথবা শেলীর একখানা কবিতার বই সামনে এগিয়ে দিয়ে ডলি বলে একটা কবিতা পড়ে শোনাবে হাসু ভাই? তোমার আবৃত্তি আমার খুব ভালো লাগে।

তাই নাকি? বজলে হোসেন হাসে আর মিটমিট করে তাকায় ওর দিকে। তারপর বইটা তুলে নিয়ে আবৃত্তি করে শোনায়

Man being reronable, muts get

Drunk

The bast of life is but intoxiction.

শুনতে শুনতে এক সময় আবেশে চোখজোড়া জড়িয়ে এলো ডলির।

নিওনের আলোয় গদি আঁটা বিছানার উপর এলিয়ে পড়লো সে।

কবিতা পাঠ থামিয়ে মৃদু গলায় বজলে হোসেন ডাকলো, ডলি।

ডলি চোখজোড়া মেলে কি যেনো বলতে যাচ্ছিলো। মুনিমকে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেলো সে।

পরনে দুপুরের সেই পোষাক।

পা জোড়া তেমনি জুতোবিহীন।

মুনিমকে এখন এ পোষাকে আশা করেনি ডলি। তাই ঈষৎ অবাক হলো। কিন্তু বজলের সামনে ওকে কিছু বললো না সে। শুধু গম্ভীরকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালো, এসো।

বইটা বন্ধ করে রেখে বজলে বললো, মুনিম যে, কি ব্যাপার আন্দোলন ছেড়ে হঠাৎ জন্মদিনের আসরে?

কেন, যারা আন্দোলন করে তাদের কি জন্মদিনের আসরে আসতে নেই নাকি? পরক্ষণে জবাব দিলো মুনিম।

বজলে একগাল হেসে বললো, না, আসতে নেই তা ঠিক নয়। তবে একটু বেমানান ঠেকে আর কি।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো মুনিম।

ডলি বিরক্তির সঙ্গে বললো, তোমরা কি শুরু করলে? বাজে কথা নিয়ে তর্ক করার আর সময় পেলে না। তারপর হাত ঘড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলো সে। চলো, ওঘরে সবাই অপেক্ষা করছে।

সোফা ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বজলে। কাপড়ের ওপরে কোত্থেকে একটা পোকা এসে বসেছিলো। হাতের টোকায় সেটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললো, চলো। বলে আর ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

বজলে চলে যাবার পরেও কেউ কিছুক্ষণ কথা বললো না ওরা। মুনিমের নগ্ন পা জোড়ার দিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে ডলি।

অপ্রতিভ হয়ে মুনিম বললো, অমন করে কি দেখছো?

ডলি ঘার নাড়লো। কিছু না। তারপর মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, আমায় এমন করে অপমান করতে চাও কেন শুনি?

মুনিম কথাটা বুঝতে না পেরে অবাক হলো। তার মানে?

তিক্ত হেসে ডলি বললো, জন্মদিনের উৎসবে খালি পায়ে না এলেও পারতে।

ও। মুহুর্তে নিজের নগ্ন পা জোড়ার দিকে তাকালো মুনিম। আস্তে করে বললো, জানো তো আমরা তিনদিন খালি পায়ে হাঁটাচলা করছি।

এখানে জুতো পায়ে দিয়ে আসলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না।

পাগল। মুনিম এবার না হেসে পারলো না।

ডলি দাঁতে ঠোঁট চেপে কি যেন চিন্তা করলো। দাঁড়াও, বাবার স্যাণ্ডেল এনে দিই তোমায়। সহসা যেন একটা সমাধান খুঁজে পেলো ডলি। ভয় নেই, এখানে তোমার বন্ধুরা কেউ দেখতে আসবে না।

হাত ধরে ডলিকে থামালো মুনিম। কি পাগলামো করছে, শোন।

কি! ডলির মুখখানা কঠিন হয়ে এলো।

মুনিম বললো, আমায় তুমি ইমমোরাল হতে বলছো?

ঈষৎ হেসে চমকে ওর দিকে তাকালো ডলি। তারপর হতাশ আর বিরক্তির চাপে ফেটে পড়ে বললো, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো গে তুমি। বার কয়েক লম্বা লম্বা শ্বাস নিলো সে। ঠিক আছে তুমি এ ঘরেই বসে। ও ঘরে যেও না। আমি আসছি। বলে চলে যাচ্ছিলো ডলি।

পেছন থেকে মুনিম সহসা বললো, আমাকে ওঘরে নিয়ে যেতে তোমার লজ্জা হচ্ছে বুঝি?

ডলি থমকে দাঁড়ালো খুব ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো ডলি। ওর চোখের মণিজোড়া জ্বলছে। ঠোঁটের প্রান্তটুকু ঈষৎ কাঁপছে। মৃদু গলায় সে বললো, হ্যাঁ। গলায় একটু জড়তা নেই। কথাটা বলে পলকের জন্যেও সেখানে অপেক্ষা করলো না ডলি, চলে গেলো।

আবার যখন ফিরে এলো তখন মুখখানা গভীর। হাতে এক প্লেট মিষ্টি।

টেবিলের ওপরে ছড়ানো বইগুলো সরিয়ে নিয়ে প্লেটটা সেখানে রাখলে সে। মুদু গলায় বললো, নাও খাও।

তুমি খাবে না?

না।

কেন?

আমি পরে খাবো। গলার স্বরে কোন উত্তাপ নেই।

প্লেট থেকে একটি মিষ্টি তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল মুনিম।

নাও, তুমি আগে খাও নইলে কিন্তু আমি একটাও খাবো না বলে দিলাম। ডলি এবার আর না করলো না।

মুনিম আস্তে করে বললো, আমার ওপরে মিছামিছি। রাগ করো না ডলি। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, আমার কোন দোষ নেই।

ডলি মৃদু হাসলো, আমি কি তোমার কাছে কোন কৈফিয়ত চেয়েছি?

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো মুনিম, টেবিল ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে সে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো, ইতস্তত করে বললো, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এক্ষুণি যেতে হবে আমার ডলি। ছ'টার সময় আমার একটা মিটিং আছে।

মিটিং? ডলির মুখখানা ম্লান হয়ে এলো। আমার জন্মদিনেও তোমাকে মিটিং-এ যেতে হবে! আমি তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবো বলে এ্যাডভান্স টিকিট কেটেছিলাম।

না ডলি, তা হয় না। মুনিমের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর। আমাকে মিটিং-এ যেতে হবে, না গেলে চলবে না।

ডলি ভ্রু বাঁকিয়ে সরে গেলো জানালার পাশে, তারপর চুপচাপ কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে।

মুনিম পেছন থেকে ডাকলো, ডলি।

ডলি ফিরে তাকিয়ে বললো, তুমি মিনিট কয়েকের জন্যেও কি বসতে পারবে না?

তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি আলাপ ছিলো।

বলো। মুনিম বসলো।

ডলি কোন রকম ভূমিকা করলো না। ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস?

মুনিম অবাক হলো। সে ভেবে পেল না কেন আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন করছে ডলি।

কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

আছে।

কারণ?

আমার প্রতি তোমার উদাসীনতা। কি মনে করছো তুমি আমায়। আমি কি তোমার ভালবাসার কাঙাল? না তোমার ভালবাসা না পেলে আমি মরে যাবো?

সব সময় তুমি সভাসমিতি আর আন্দোলন নিয়ে থাকবে। আর আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে, কি মনে করেছে তুমি? আমি বাচ্চা খুকি নই। সব বুঝি, এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে রীতিমত হাঁপাতে লাগলো ডলি।

কি বলবে, কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না মুনিম। হতবিহবলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। ইতস্তত করে বললো, তোমার এসব প্রশ্নের জবাব দেবার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই।

ডলি তীব্র গলায় বললো, যাচ্ছতো, আর এসো না।

যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে ফিরে তাকালো মুনিম। তারপর বললো, আচ্ছা! বলে বেরিয়ে গেলো সে।

মুনিম চলে গেলে খানিকক্ষণ পাথরে গড়া পুতুলের মুর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ডলি।

দেহটা উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলে পর একখানা সোফার উপর বসে পড়লো সে।

পাশের ঘরে ডলিকে খোঁজ করে না পেয়ে এ ঘরে এলো বজলে হোসেন।

দেখা পেয়ে ঈষৎ ক্লান্তির ভাব করে বললো, কি ব্যাপার, তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। এখানে একা বসে করছে কি তুমি?

কিছু না। এমনি বসে আছি। ডলি সোফার ওপরে মাথাটা এলিয়ে দিলো। তোমার শরীর খারাপ করছে নাকি?

না।

মুনিম কি চলে গেছে?

হ্যাঁ

ওকি, তোমার মাথা ধরেছে নাকি। অমন করছে কেন?

কি করছি। ওর উদ্বেগ দেখে ফিক করে হেসে দিলো ডলি।

তারপর কি মনে হতে আজ এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে বজলেকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলো ডলি। তারপর অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো, আচ্ছা হাসু বাই, রোজ তুমি কেন এখানে আস বলতো?

বজলে ইতস্তত করে বললো, যদি বলি তোমাকে দেখতে।

ওর কথায় হঠাৎ যেন শিউরে উঠলো ডলি। মনে মনে খুশি হলো সে। প্রসন্ন হলো।

কিন্তু সে ভাবটা গোপন রেখে আবার জিজ্ঞেস করলো, কেন দেখতে আসো? দেখবার মতো কি আছে আমার?

তোমার রূপ! তোমার সৌন্দর্য। নরম গলায় জবাব দিলো বজলে।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। এক ঝলক সূক্ষ্ম হাসি ঢেউ খেলে গেলো ঠোঁটের এক কোণ ঘেঁষে। সাদা গাল রক্তাভ হলো। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সহসা সে বললো, আমার কাছে একখানা বাড়তি টিকিট আছে, সিনেমায় যাবে?

অফকোর্স। বজলের মনটা খুশিতে ভরে উঠলো।

ডলি ওর দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বললো, চলো।

পথে ডলি রিকসা নিতে চাইলো।

বজলে বললো, না জন্মদিনে রিকসা নয় ট্যাকসিতে যাবো।

ডলি না করতে পারলো না। মৃদু স্বরে বললো, তাই ডাকো।

সিনেমা হলে এসে মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। শাহানাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মাহমুদ। কাঁধের উপরে ঈষৎ চাপ দিয়ে বজলে চাপা গলায় শুধালো, শাহানা বুঝি আজকাল তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ। মাহমুদ মৃদু হাসলো। জান তো, ওর স্বামী ওকে ডিভোর্স করেছে। এখন আমার কাছে থাকে।

শাহানার পরনে একটা কমলা রঙের শাড়ি। গায়ে কারু আঁকা ব্লাউজ। পায়ে একজোড়া হাইহিল জুতো। ডলির সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল বজলে। কাঁধটা একদিকে ঈষৎ কাৎ করে পিটপিট চোখে ডলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধূর্তের মতো হাসলো মাহমুদ। তারপর বজালেকে একপাশে ডেকে এনে বললো, মেয়েটা দেখতে বেশ তো। জোটালে কোত্থেকে।

বজলে বিস্মিত হলো। তোমাকে ওর কথা আগে একদিন বলেছিলাম, বলিনি?

কই মনে পড়ছে নাতো?

হ্যাঁ বলেছিলাম। তুমি ভুলে গেছো। ও আমার মামাতো বোন।

ওর কাঁধজোড়া ঝাঁকালো মাহমুদ। তারপর অদূরে দাঁড়ানো ডলির দিকে বারকয়েক ফিরে ফিরে তাকালো সে।

বজলে ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলো।

মাহমুদ বললো, চলো এককাপ করে কফি খাওয়া যাক। শো শুরু হবার এখনো বেশ দেরি আছে।

বজলে বললো, চলো।

শাহেদ চলে যাবার পর, টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে একটা বই নাড়াচাড়া করলো সালমা। বইতে আজ মন বসছে না তার। বড় চাচার শেষের কথাগুলো বারবার কানে বাজছে। আর রওশনের মুখখানা ভেসে উঠছে বইয়ের পাতায়। বসে বসে অনেক অবাস্তব চিন্তার জাল বুনে চললো সে। এখন যদি হঠাৎ রওশন এখানে এসে পড়ে? কে জানে হয়তো এর মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে দেশে। রওশন ছাড়া পেয়েছে। জেল থেকে। তার চোখে মুখে আনন্দের চমক। সে দোরগোড়া থেকে ডাক দিলো, সালমা আমি এসেছি। দরজা খোল। না, এই নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগে না। এই ক্ষুদ্র দেহে একবড় ক্লান্তির

বোঝা আর বয়ে বেড়াতে পারে না সালমা। পাশের বাড়ির রেডিওটায় কি একটা গান হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে কান পেতে সেটা শুনতে চেষ্টা করছিলো সে। সদরে কড়া নড়ার শব্দ হতে বইটা বন্ধ করে রেখে পরনের কাপড়াটা দু'হাতে একটু পরিপাটি করে নিলো সালমা। দরজাটা খুলে দিয়ে ঠিক তাকে চিনতে পারলো সে। আপনি আসাদ ভাই না?

হ্যাঁ। আস্তে জবাব দিলো আসাদ।

আসুন।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এলো সালমা। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, বসুন।

আসাদ বসলো। বসে চারপাশে চোখ বুলিয়ে এটা সেটা দেখতে লাগলো সে। সালমা ভাবলো, এমনি বোবার মত চুপ করে বসে থাকা যায় না। কিছু একটা বলতে হয়। কিন্তু বলার মত কোন কথা খুঁজে পেলো না সে। অবশেষে ইতস্তত করে শুধালো চা খাবেন।

না থাক। আসাদ নড়েচড়ে বসলো।

না কেন। খান না এককাপ। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে খাটের তলা থেকে ষ্টোভটা টেনে নিলো সালমা।

আসাদ এবার না করলো না। সেও খুঁজছিলো মনে মনে। কিছু বলতে হবে। এমনি জড়ের মত কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। আর একটু পরে একটা প্রশ্ন করলো সে। আপনি বুঝি মেডিকেলে পড়েন?

ইউনিভার্সিটিতে।

ও। সালমা স্টোভে আগুন ধরিয়ে দিলো।

খানিকক্ষণ পর আসাদ আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনার ছোট ভাইকে দেখছি না যে, উনি কোথায়?

শাহেদের প্রসঙ্গ উঠতে মুখখানা কালো হয়ে গেলো সালমার। গলা নামিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে বললো, ও সিনেমায় গেছে।

সিনেমায়? আসাদ রীতিমত অবাক হলো। কিন্তু এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলো না সে। চায়ের পেয়ালাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে আলোচনাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সালমা। আজ ধরপাকরা হয়েছে। শুনেছেন কিছু?

না।

কাল তো রোজা রাখতে হবে।

হ্যাঁ।

ভোররাতের কিছু বন্দাবেস্ত করেছেন?

ভাত রেঁধে রেখেছি। তরকারি নেই, সাদা ভাত। শুধু ডিম দিয়ে খেতে হবে কিন্তু। ঈষৎ হাসলো সালমা।

আসাদ আস্তে করে বললো, আমার অভ্যোস আছে।

রাতে বাসায় ফিরতে বেশ দেরি হলো মুনিমের। সারাদিন ছুটাছুটি করে ভীষণ ক্লান্ত সে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার শক্তি পাচ্ছিলো না। কিন্তু এই অপরিসীম ক্লান্তির মাঝেও কোথায় যেন একটা অফুরন্ত শক্তির উৎস লুকিয়ে ছিলো। যা তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো সামনের দিকে। মনে পড়লো। বাবার কেরানী বন্ধু রসুল সাহেবের সঙ্গে আজ বিকেলে যখন মেডিকেলের সামনে দেখা হয়েছিলো তখন তিনি কাছে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এবার কি একেবারে চুপ করে থাকবে তোমরা? কিছু করবে না?

আমরা আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখছেন তো আমাদের হাত পা একেবারে বাঁধা। বলেছিলো আরেকজন। সে লোকটা কাজ করে কোন এক ব্যাঙ্কে।

ওদের কথা ভাবতে গেলে নিজেকে অনেক বড় মনে হয় মুনিমের। আর তখন সমস্ত ক্লান্তি তার কর্পূরের মতো উড়ে যায়।

বাসায় ফিরে মুনিম দেখলো, টেবিলে ভাত সাজিয়ে মা বসে আছেন। আমেনার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করছেন তিনি। ওকে আসতে দেখে মা তিরস্কার করে বললেন, এই একটু আসি বলে সকালে বেরিয়ে গিয়ে এই রাত দশটায় ফিরছিস তুই। এদিকে আমি চিন্তা করে মরি। ঘর বাড়ি কি কিছু নেই নাকি তোর?

মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো মুনিম। তারপর গভীর গলায় বললো, জানো মা, সেবার যে গুলি করে কতগুলো ছেলেকে মেরেছিলো, তাদের জন্যে আমরা একটু শোক করবো তাও দিচ্ছে না ওরা।

মিনসেদের হয়েছে কি। কাঁদতেও দেবে না নাকি? মা অবাক হলেন। মুনিম সাগ্রহে বললো, তাইতো মা, কাঁদবার জন্যে আন্দোলন করছি।

কিন্তু বাবা তোমার আন্দাোলন করে কাোজ নেই। পরীক্ষণে জবাব দিলো মা। যে মায়ের পাঁচ-সাতটা ছেলে আছে তারা আন্দাোলন করুক। তুমি আমার এক ছেলে, তোমার ওসবে দরকার নেই।

আরো কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে মা চলে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। হতাশ হয়ে টেবিলের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মুনিম। মাকে নিয়ে বড় জ্বালা ওর।

মা চলে যেতে আমেনা বললো, মিন্টু এসেছিলো। কি একটা বই দিয়ে গেছে তোমার জন্যে। বলে মায়ের ঘর থেকে বইটা এনে ওর হাতে দিতে গিয়ে ফিক করে হেসে দিলো আমেনা। তারপর চলে গেলো সে।

প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলো মুনিম। পরে, বইটা দেখে বুঝতে পারলো কেন হেসেছে আমেনা। বহুদিন আগে কোন এক জন্মদিনে যে বইটা ডলিকে উপহার দিয়েছিলো সে, সেটা মিন্টুর হাতে ফেরত পাঠিয়েছে ডলি। কি অর্থ হতে পারে এর?

চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ, না ক্ষণিকের অভিমান?

বইটা ওলটাতে গিয়ে মুনিম দেখলো ভেতরে একখানা চিঠি। আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা খুলে পড়লো মুনিম। ডলি লিখেছে,

মুনিম,

তুমি উত্তর মেরুর মানুষ, আমি দক্ষিণ মেরুর। ভেবে দেখলাম তোমাতে আমাতে মিলন সম্ভব নয়। তাই বজলেকে গ্রহণ করলাম। ওকে আমি ভালবাসি নি কোনদিন। তবু, একই মেরুর মানুষ তো, খাপ খাইয়ে নিতে পারবো। তুমিও পারবে বলে আশা করি।

ইতি। -ডলি

চিঠি পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেলো মুনিম।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তার ওপরে বসলো সে।

হয়তো এমনো হতে পারে যে ডলি যা লিখেছে সেটা ওর মনের কথা নয়।

হয়তো বা মনের কথা। কিন্তু হঠাৎ এমন পরিবর্তনের কি হেতু থাকতে পারে?

মুনিম তো কোন দুব্যবহার করে নি ওর সঙ্গে।

ডলি নিজে রাগ করে যেতে নিষেধ করেছ।

একটু পরে চিঠিটা জামার পকেটে রেখে দিয়ে মুনিম ভাবলো কাল একবার সময় করে ডলির সঙ্গে দেখা করবে।

রাতে জাহানারাদের বাসায় থাকবে বলে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিয়েছিলো মুনিম। ঘরে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় হামলা হতে পারে।

তাই রাতের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আমেনাকে বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় নেমে এলো মুনিম।

পেছন থেকে আমেনা চাপা স্বরে বললো, সাবধানে থেকে ভাইয়া।

মুনিম অন্ধকারে মৃদু হাসলো।

বাইরের জীবনে যখন গভীর নৈরাশ্য পাথরের মত চেপে বসছে মানুষের মনে, যখন প্রতিটি পদক্ষেপ শঙ্কা ভয় আর ত্রাসে জড়িয়ে আসতে চায় আর একটি মুহুর্তের জন্যে মানুষ তাকে বিপদমুক্ত বলে ভাবতে পারে না, সব সময় মনে হয় ওই বুঝি মৃত্যু নেমে এলো তার ভয়াবহ নীরবতা নিয়ে, তখনো সংসারে স্নেহ প্রেম আর ভালবাসা পাশাপাশি বিরাজ করে বলেই হয়তো মানুষগুলো এখনো বেঁচে আছে। একবার চারপাশে সন্তর্পণে তাকিয়ে নিয়ে দ্রুত সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে ওপাশের সরু গলিতে গিয়ে ঢুকলো মুনিম।

জাহানারা আর তার অধ্যাপক স্বামী, টেবিলে ভাত সাজিয়ে ওর অপেক্ষায় বসেছিল। ওরা ভেবেছিলো হয়তো মুনিম এখানে খাবে। তাই দোকান থেকে কিছু ভাল কবাব এনে রেখেছিলো।

জাহানারা ভাত খাবে না। রুটি খাবে। দুদিন থেকে ঠাণ্ডা লেগে গায়ে মৃদু জুর এসেছে ওর। তাছাড়া এক বেলা রুটি খাবার চিন্তাটা কিছুদিন থেকে মাথায় ঢুকেছে। ওতে নাকি বাড়তি মেদ কমে যায়। জাহানারার মতে শুধু ওর কেন সবার মতে দিনে দিনে বড় বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। পরিচিত দু'একজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করেছে জাহানারা। সব রোগের ওষুধ আছে, আর এই যে বিশ্রী রকমের মোটা হয়ে যাচ্ছি। এর কোন ওষুধ নেই আপনাদের কাছে?

ডাক্তার বন্ধুরা কেউ শব্দ করে হেসে দিয়েছে, আছে। বইকি। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিন। দেখবেন, যে হারে মোটা হয়েছেন সে হারে শুকিয়ে যাবেন।

কেউ বলেছে, সকালে উঠে কিছু ডনবৈঠক দিন। দেখবেন দু'দিনেই সব বাড়তি মাংস করে যাবে।

আবার কেউ বলেছে, এক কাজ করুন না, দু'বেলা ভাত খাওয়াটা বন্ধ করে একবেলা রুটি খেতে শুরু করুন। আর দৈহিক শ্রমটা বাড়িয়ে দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

শেষের প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো জাহানারার। তাই ক'দিন ধরে একবেলা রুটি খাবার চিন্তা করছিলো সে।

মুনিম এসে জানালো সে খেয়ে এসেছে। শুনে আহত হলো জাহানারা।

বললো, তোমাকে তখন বলে দিয়েছিলাম, এখানে খাবে।

মুনিম কি জবাব দেবে প্রথমে কিছু ভেবে পেলো না। পাঠ না পারা ছাত্রের মত বার কয়েক ঘাড় চুলকালো সে। একবার অধ্যাপকের দিকে আর একবার জাহানারার দিকে তাকিয়ে বললো, উপায় ছিলো না, বুঝলে বাসায় না খেলে মা ভীষণ রাগ করতেন। আর তুমি তো জান উনি আমাকে নিয়ে সব সময় কেমন বাড়াবাড়ি করেন।

জাহানারা কিছু বলতে যাচ্ছিলো। অধ্যাপক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, খেয়ে এসেছে। ভালো কথা। আমরা অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, বেশি না পারো আমাদের সঙ্গে অল্প চারটে খাও। অন্তত কাবাবটা। ওটা তোমার জন্যেই আনা।

না বললে যে ওদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না তা জানতাে মুনিম।

অগত্যা চেয়ার টেনে বসলো সে।

খাওয়ার অবসরে বাইরের অবস্থা জানতে চাইলো অধ্যাপক।

কাল সত্যি সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে? আবার সেই বায়ান্ন সালের পুনরাবৃত্তি হবে না তো, আবার সেই রক্তপাত?

অধ্যাপক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। তার প্রশস্ত কপালের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। মাথাটা ঈষৎ বুকে এলো সামনে। মুনিমের

কাছ থেকে কোন জবাব না। পেয়ে নিজে থেকে আবার বলতে লাগলো। সে, তোমাদের ওই নেতাদের ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। আমি জানি এবং বেশ ভালো করে জানি, ওদের মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। কতগুলো ভীরু কাপুরুষ ওরা! তোমার কি মনে হয় ওরা এ সময়ে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?

মুনিম এবারও নিরুত্তর রইলো। নেতাদের সে নিজেও যে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখে তা নয়। আর বিশ্বাস করবেই বা কেমন করে। নেতাদের কাছে দল বেঁধে দেখা করতে গিয়েছিলো। ওরা ওদের সক্রিয় সাহায্য চেয়েছিলো, ওরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে।

বিব্রত গলায় বলছে, দেখো সাংঘাতিক কিছু করে বসো না তোমরা। দেখো যেন শান্তি ভঙ্গ না হয়।

শান্তি বলতে কি মনে করে ওরা।

অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা? আক্রমণের মুখে আত্মসমর্পণ?

আমি জানি। তোমাদের ওই নেতারা কি চায়। টেবিলের ওপাশ থেকে অধ্যাপক আবার বললো, ওদের আশু লক্ষ্য হলো গদি দখল করা। আর পরবর্তী অভিপ্রায় হলো বাকি জীবনটা যাতে স্বচ্ছন্দে কাটে সে জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করা। তুমি কি মনে করেছে ওরা এ দেশকে ভালবাসে? দেশবাসীর জন্যে দরদে বুক ওদের ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তাই না? তুমি কি--। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো অধ্যাপক। মুনিম মাঝপথে বাধা দিয়ে বললো, তা আমি জানি। তারপর আবার চুপ করে গেলো সে। খানিকক্ষণ তিনজনে নীরব রইলো।

ছোট মেয়েটা ঘুম থেকে ওঠে কান্না জুড়ে দিয়েছিলো। উঠে গিয়ে তাকে শান্ত করে এসে আবার টেবিলে বসলো জাহানারা। অধ্যাপক স্ত্রীর দিকে এক পলক তাকালো, তারপর মুনিমের দিকে চোখজোড়া ফিরিয়ে এনে আবার বললো, কিন্তু ওরা যদি এ সময়ে তোমাদের পাশে এসে না দাঁড়ায় তাহলে একা একা কতক্ষণ লড়বে তোমরা?

তা জানি না।

মুনিমকে হঠাৎ যেন বড় চিন্তিত মনে হলো। একটু থেমে আস্তে সে বললো, শুধু জানি, ওদের জন্যে আমাদের কাজ থেমে থাকবে না।

এক টুকরো রুটি মুখে তুলতে গিয়ে থেমে মুনিমের দিকে তাকালো জাহানারা।

অধ্যাপকের মুখখানা শিশুর সরল হাসিতে ভরে উঠলো।

বার কয়েক মাথা নেড়ে সে বিড়বিড় করে বললো, হ্যাঁ, এমন কথা শুধু তোমরাই বলতে পারো। যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালবাসতে শিখেছে। শুধু তারাই বলতে পারে। হ্যাঁ, কেবলমাত্র তারাই পারে। আনন্দে দেহটা বার কয়েক কেঁপে উঠলো তার।

কিন্তু মনিম জানে এ কথা ওর নয়।

আরেকজনের।

বাইশে ফেব্রুয়ারি গুলি খেয়ে মরেছে সেই হাইকোর্টের মোড়ে, তিন বছর আগে।

তিন বছর?

হ্যাঁ তিনটে বছর। কিন্তু এখনো তার মুখখানা স্পষ্ট মনে আছে মুনিমের। শুধু তার মুখ কেন, তাদের সকলের মুখ আজো ভেসে ওঠে তার চোখে।

কাক ডাকা ভোর না হতে সেদিন দলে দলে তারা এসে জমায়েত হয়েছিলো মেডিকেল কলেজের পুরোনো হোস্টেলে।

ছেলে। বুড়ো। মেয়ে।

ছাত্র। শ্রমিক। কেরানী।

কত লোক হবে?

কেউ শুনে দেখে নি। আকাশের তারা গুনে কি শেষ করা যায়। যেদিকে তাকাও সমুদ্রের মত ছড়িয়ে আছে জনতা। আর সবার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।

এর জন্যে বুঝি পাকিস্তান চেয়েছিলাম আমরা?

আমাদের ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে মারবার জন্যে?

হায় খোদা তুমি ইনছাফ করো এর!

গায়েবি জানাযা পড়ার জন্যে সমবেত হয়েছিলো ওরা। আর বুড়ো ইমাম সাহেব মোনাজাত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, যারা আমাদের কচি ছেলেদের গুলি করে মারলো, খোদা তুমি তাদের ক্ষমা করো না।

সূর্য তখন ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছিলো পুবের আকাশে।

গায়েবি জানাযা শেষ হলে পর জোয়ারের বেগে মিছিলে বেরিয়ে পড়লো সবাই। নেতারা কেউ ছিলেন না।

তারা কখনই বা ছিলেন?

ফরহাদ বললো, বাদ দাও ওদের কথা। আমাদের কাজ আমরা করে যাবো। মেডিকেল থেকে বেরিয়ে মিছিলটা এগিয়ে চলেছিলো হাইকোর্টের দিকে। ফরহাদ হাত ধরে টানলো ওর। এসো মুনিম।

তারপর জনতার মাঝখানে হারিয়ে গেলো। ওরা।

ভাইসব মিছিলে আসুন। কে যেন ডাকলো।

তুমি কি যাবে না, চলে এসো।

খোদার কাছম বলছি। ওরা জাহান্নামে যাবে। খোদা কি ওদের বিচার করবে না মনে করছো? আলবত করবেন।

ওকি কাঁদছেন কেন। কেঁদে কি হবে।

আওয়াজ তুলুন ভাইসব।

তারপর সাগর কল্লোলের মত চিৎকারে ফেটে পড়লো বিক্ষুব্ধ জনতা।

ফরহাদের হাতে একটা নাড়া দিয়ে মুনিম বললো, তোমার কি মনে হয় আজকেও ওরা গুলি করবে?

জানি না। মৃদু গলায় জবাব দিয়েছিলো ফরহাদ। করলে করতে দাও। ক'জন মারবে ওরা।

প্রশস্ত রাস্তা জুড়ে মিছিলটাি এগিয়ে চলেছিল হাইকোর্টের পাশ দিয়ে। অকস্মাৎ কয়েকখানা মিলিটারি লরী দ্রুতবেগে এসে রাস্তার তেমাথায় যেখানে লম্বা পলাশ গাছটায় অসংখ্য লালফুল ধরেছিলো, সেখানে এসে থামলো। আর পরীক্ষণে ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা সার বেঁধে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে রাইফেলের নলগুলো তাক করে ধরলো মিছিলের দিকে। কয়েকটি উত্তেজিত মুহুর্ত।

ভাবতে গায়ের লোমগুলো এখনো বর্শার ফলার মত খাড়া হয়ে যায় মুনিমের। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তচিৎকার ভেসে আসে কানে।

খোদা ইনছাফ করবে।

খোদা আমি যে মরে গেলাম।

মাগো।

আমাকে বাঁচাও, মরে গেলাম।

মুমূর্ষের চিৎকার আর পোড়া বারুদের গন্ধ।

পোনা মাছের মতো মানুষগুলো ছুটে চারপাশে। হাইকোর্টের রেলিঙ ডিঙ্গিয়ে ভেতরে আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলো যে লোকটা, রেলিঙের উপরেই ঝুলে পড়লো সে। কে জানে হয়তো শেষ মুহুর্তে স্ত্রীর মুখখানা ভেসে উঠেছিলো তার চোখে। বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পড়েছিলো। হঠাৎ তাইতো জীবনের প্রতি গভীর মমতা জন্মে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো পালিয়ে বাঁচবে। কিন্তু সে জানতো না ইতিমধ্যে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। আরেকটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলে। পায়ে গুলি লেগেছিলো তার, তবু বুকে হেঁটে পালাতে চেষ্টা করছিলো সে আর ভয়ার্তা স্বরে বারবার বিড়বিড় করে বলছিলো, আমাকে মেরো না।

কিছুদূর এগুতে জন্মের মত বাক রোধ হয়ে গেলো তার।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেলেটির দিকে ছুটে গিয়েছিলো ফরহাদ।

তার গায়ে যে গুলি লাগতে পারে সে কথা মনে ছিলো না। শুধু মনে ছিলো, আমাদের কাজ আমরা করে যাবো।

কি ভাবছো অমন করে? অধ্যাপকের গলার স্বরে চমকে তার দিকে তাকালো মুনিম। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জগ থেকে এক গ্রাস পানি ঢেলে নিয়ে সে বললো, আমি বুঝতে পারছি তুমি কি ভাবছ।

কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, দিন এক রকম যায় না। বলে পানির গ্রাস এক নিঃশ্বাসে শেষ করে হাত ধোয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সে। ওদের আলোচনার বিষয়গুলো খুব উপাদেয় লাগছিলো না জাহানারার। তাই বিষয়ান্তরে যাবার জন্যে মুনিমের দিকে একটু বুকে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, ডলির কি খবর?

নিজেকে সহসা বড় অসহায় মনে হলো মুনিমের। কে জানে, জাহানারা হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছে সব, কিম্বা শোনে নি। তবু কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সে।

জাহানারা আবার প্রশ্ন করলো, ডলি কেমন আছে?

মুনিম বললো, জানি না।

জাহানারার ঠোঁটে মৃদু হাসি জেগে উঠলো। না জানবার তো কথা নয়।

জাহানারার দিকে স্থির চোখে তাকালো সে। মুখখানা বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতায় ভরা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে বললো, তার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না জাহানারা, প্লিজ-। দৃঢ় গলায় কথাটা বলবে ভেবেছিলো, কিন্তু ফাটা বাঁশের বাঁশির মত শোনাল সবকিছু। এ সময় ডলির কথাটা না তুললে কি ভাল করতো না জাহানারা?

কাণ্ডজ্ঞানহীন আর কাকে বলে। তার ওপর রাগ করার কোন অর্থ হতে পারে না জেনেও চেয়ারটাতে সশব্দে পেছনের দিকে ঠেলে, পাশের ঘরের যেখানে অধ্যাপক হাত ধুয়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো, সেখানে তার পাশে গিয়ে বসলো মুনিম।

জাহানারা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

রাত দুপুরে কিউ খানের বাসা থেকে লোক আসবে তাকে ডাকতে, এ কথা ঘুমোবার এক মুহুর্ত আগেও ভাবেনি মাহমুদ। লেপের ভেতরে কি আরামে শুয়েছিল সে। একটা সুন্দর স্বপ্নও ইতিমধ্যে দেখেছিলো। এখন আবার কাপড় পড়ে যেতে হবে সেই দু' মাইল দূরে, কিউ খানের বাসায়। ভাবতে গিয়ে মেজাজটা বিগড়ে গেলো মাহমুদের। দুত্তরি তোর চাকুরির নিকুচি করি। রাত নেই দিন নেই ডেকে পাঠাবে, যেন কেনা গোলাম আর কি। মনে মনে বিড়বিড় করলে সে। তারপর গরম কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে একটু পরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সাহানা ঘুমুচ্ছে।

ঘুমোক।

কিউ খানের বাসায় এসে দেখলো সে একা নয়। আরো অনেকে এসেছে সেখানে। বাইরে বারান্দায় রীতিমত ভিড় জমে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাসটা নীল হয়ে আসছে। ইন্সপেক্টর রশীদকে সামনে পেয়ে একপাশে ডেকে নিয়ে এলো মাহমুদ। ব্যাপারটা কি বলতো, এই রাত দুপুরে?

ইন্সপেক্টর রশীদ বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, রাতে কয়েকটি বাসা সার্চ করতে হবে বোধ হয়, আমি ঠিক জানি না। তারপর গলার স্বরটা আরো একটু নামিয়ে এনে বললো, বড় কর্তারা সবাই ভীষণ ক্ষেপে গেছে। ভেতরে এখন ক্লোজ ডোরে আলাপ-আলোচনা চলছে ওদের।

মাহমুদ বললো, তাহলে এখনো কিছু ঠিক হয় নি।

রশীদ মাথা নাড়লো, না।

মাহমুদ হতাশ গলায় বললো, রাতের ঘুমটা একেবারে মাটি হলো। রশীদ মৃদু হেসে বললো, ক'রাতের হয় দেখো। আবহাওয়া ভীষণ গরম। বড় কর্তা রেগে গিয়ে বলেছে, এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে শহরে অথচ কাউকে গ্রেফতার করা হলো না, কেমন কথা?

মাহমুদ বললো, আমারো তাই মত। ধরে সবগুলোকে জেলে পোরা উচিত। রশীদ আবার হাসলো। তেমনি চাপা স্বরে বললো, ধরা উচিত তো বুঝলাম। কিন্তু ক'জনকে ধরবে।

মাহমুদ পরীক্ষণে বললো, কেন যারা এসব করছে তাদের সকলকে। বাইরে আকাশটা কুয়াশায় ছাওয়া ছিলো। সেদিকে তাকিয়ে ইনসাপেক্টর রশীদ জবাব দিলো, ধরে শেষ করতে পারবে বলে তো মনে হয় না। বলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো রশীদ। কেউ শুনলো নাতো?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাহমুদ কাঁধ ঝাঁকালো। যাকগে, আমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কর্তারা যা করার করবে। যদি বলে ধরো, ধরবো। যদি বলে ছাড়ো, ছাড়বো। যদি বলে মারো, মারবো। আমাদের কি ভাই, টাকা পাই চাকরি করি। বলে একটা চেয়ারের ওপর ধাপ করে বসে পড়লো মাহমুদ। হ্যাঁ তোমার কাছে সিগারেট আছে? তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে আমার প্যাকেটটা ফেলে এসেছি বাসায়। রশীদ কিছু বললো না, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলো তার দিকে। বাইরে ঘন কুয়াশা ঝরছে।

ভেতরে কর্তারা বৈঠক করছেন এখনো।

মাঝে মাঝে তাদের হাসির শব্দ ভেসে আসছে বাইরে। মাঝে মাঝে উগ্র গলার স্বর। এখান থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না কি বলছে তারা। মাহমুদ সিগারেটে একটা জোর টান দিলো।

পরদিন বিদ্যালয়ের গেটে যেখানে নোটিশ বোর্ডগুলো টাঙ্গানো ছিলো, তার পাশে সাটানো, লাল কালিতে লেখা একটি দেয়াল পত্রিকার উপর দল বেঁধে বুকে পড়লো ছেলেমেয়েরা। কারো পরনে শাড়ি, কারো সেলওয়ার। দেয়াল পত্রিকাটা পড়ছিলো আর গম গম স্বরে কথা বলছিলো ওরা।

নীলা আর বেনু অদূরে দাঁড়িয়ে।

সারা রাত জেগে ওই দেয়াল পত্রিকা লিখেছে ওরা।

কাল রাতে কেউ ঘুমোয় নি।

কালো বার্নিশ দেয়া কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে পা টিপে টিপে যখন নিচে নেমে আসছিলো নীলা তখন হাত ঘড়িটায় বারটা বাজে। চারপাশে ঘুটফুটে অন্ধকার আর চাপা গলার ফিসফিসানি। করিডোর পেরিয়ে ডান কোণে বেনুর ঘরে এসে জমায়েত হয়েছিল ওরা।

বাতি কি জ্বালবো?

না।

মোম আছে?

আছে।

জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। সুপার কি ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ।

দরজায় খিল দিয়ে দাও। ম্যাচেশটা কোথায়। আহ শব্দ করো না, সুপার জেগে যাবে।

টেবিল চেয়ারগুলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে, মসৃণ মেঝের ওপরে গোল হয়ে বসলো ওরা।

বাইরে রাত বাড়ছে।

মা েমবাতির মৃদু আলোয় বসে দেয়াল পত্রিকাগুলো লিখছে ওরা। তাই আজ বিদ্যালয়ের সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ওরা কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিলো কে কি মন্তব্য করে।

আমতলীয় জটলা করে দাঁড়িয়েছিলো তিনটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।

একটি ছেলে সহানুভূতি জানিয়ে একটি মেয়েকে বললো, খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাতো আপনাদের?

কষ্ট? কি যে বলেন। মেয়েটি ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বললো, খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস আছে আমাদের।

অদূরে বেলতলায় বসে একদল নতুন ছেলেকে একুশে ফেব্রুয়ারির গল্প শোনাচ্ছিলো কবি রসুল।

সত্যি বরকতের কথা ভাবতে গেলে আজো কেমন লাগে আমার। মাঝে মাঝে মনে হয় সে মরে নি। মধুর রেস্তোরায় গেলে এখনো তার দেখা পাবো। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো তার। সে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। কালো রঙের লম্বা লিকলিকে ছেলে।

সেদিন এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম আমরা। রাইফেলধারী পুলিশগুলো তখন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে। ইউনিফর্ম পরা অফিসাররা ঘোরাফেরা করছিলো এদিক সেদিক আর মাঝে মাঝে উত্তেজিতভাবে টেলিফোনে কি যেন আলাপ করছিলো কর্তাদের সঙ্গে। বলতে গিয়ে সেদিনের সম্পূর্ণ ছবিটা ভেসে উঠলো। কবি রসুলের চোখে। সকাল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে জমায়েত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। শহরে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ। দল বেঁধে কেউ আসতে পারছে না। তাই। তবু এলো।

বেলা এগারোটায় আম গাছতলায় সভা বসলো ওদের।

দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর সভা।

একশ’ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করার চিন্তা করছিলো ওরা।

একজন বললো, ওসব হুজ্জত হাঙ্গামা না করে আসুন আমরা প্রদেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাই।

ওসব স্বাক্ষর অভিযান বহুবার করেছি। ওতে কিছু হয় না। কে একজন চিৎকার করে উঠলো সভার এক প্রান্ত থেকে।

আর একজন বললো। ওসব মিষ্টি মিষ্টি কথা ছেড়ে দিন কর্তারা।

মিষ্টি কথায় চিড়া ভেজে না। কিছু হবে না ওসব করে।

ওরা তবু বললো। হবে, হবে না কেন। আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তারপর মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশন পাঠাবো।

ওই মন্ত্রীদের কথা রেখে দিন। হঠাৎ ডায়াসের পাশ থেকে কে একজন লাফিয়ে উঠলো।

মন্ত্রীদের আমরা চিনে নিয়েছি।

আরেকজন বললো। দালালের কথা আমরা শুনতে চাই না।

আপনারা বসে পড়ুন।

তারপর বসে পড়ুন চিৎকারে ফেটে পড়লো সমস্ত সভা।

তবু ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, দেখুন,আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আপনারা দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমায় বিশ্বাস করুন। দেখুন। শুনুন।

না, না। আপনার কথা শুনবা না। আপনি বসে পড়ুন।

আরে, এ লোকটা আচ্ছা পাইট তো, আমরা শুনতে চাইছি না। তবু জোর করে শোনাবো।

আরে তোমরা করছে কি লোকটাকে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিতে পারছে না? সভার মধ্যে ইতস্তত চিৎকার শোনা গেলো। অবশেষে বসে যেতে বাধ্য হলো লোকটা।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বক্তাদের বাকযুদ্ধ চললো।

কেউ বললো, অমান্য করো।

কেউ বললো, অমান্য করো না।

অবশেষে ঠিক হলো, দশজন করে একসঙ্গে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করবে ওরা। দল বেঁধে সবাই জেলে যাবে। তবু তাদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবে না।

তখন বেলা বারটা।

শীতের মরশুম হলেও সে বছর শীত একটু কম পড়েছিলো। রোদ উঠেছিলো প্রখর দীপ্তি নিয়ে। সে রোদ মাথায় নিয়ে প্রথম দলটা তৈরি হলো আইন অমান্য করার জন্য। একটা লম্বা মত ছেলে ওদের নাম ঠিকানাগুলো টুকে নিচ্ছিলো খাতায়।

আপনার কোন কলেজ?

জগন্নাথ।

আপনার?

আমার কলেজ নয় স্কুল। আরমানিটোলা।

আপনি কোন কলেজের?

মেডিকেল।

আপনি?

ইউনিভারর্সিটি

আর আপনি?

ঢাকা কলেজ।

সবার নাম আর ঠিকানাগুলো একটা খাতায় লিখে নিলো সে।

গেটের বাইরে দাঁড়ানো পুলিশের দল ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছিলো। তাই তারাও তৈরি হয়ে নিলো।

একটু পরে ছাত্রদের প্রথম দলটা বেরুলো বাইরে। দশটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওরা শ্লোগান দিলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পুলিশের দল এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। তারপর গ্রেপ্তার করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিলো সবাইকে।

একটু পরে বেরুলো দ্বিতীয় দল।

তারপর তৃতীয় দল।

পুলিশ অফিসাররা হয়ত বুঝতে পেরেছিলো, গ্রেপ্তার করে শেষ করা যাবে না। তাই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্যে একজন বেঁটে মোটা অফিসার দৌড়ে এসে অকস্মাৎ একটা কাঁদুনে গ্যাস জুড়ে মারলো ইউনিভারসিটির ভেতরে।

তারপর আরেকটা।

তারপর কাদুনে গ্যাসের ধোঁয়ায় ইউনিভার্সিটি এলাকা নীল হয়ে গেলো। ছেলেমেয়েরা ছিটকে পড়লো চারদিকে। ছত্রভঙ্গ হলো। চোখগুলো সব জ্বালা করছে। ঝাপসা হয়ে আসছে চারদিক। পানি ঝরছে। দুহাতে চোখ ঢাকিলো। কেউ দু'চোখে রুমাল চাপা দিলো। কাদুনে গ্যাসের অকৃপণ ধারা তখনো বর্ষিত হয়ে চলেছে। একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো বেলতলায়। দুটো মেয়ে ছুটে এসে পাজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে এলো তাকে।

আমি আর বরকত দেয়াল টপকে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ঢুকলাম।

তারপর সেখান থেকে দৌড়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে।

ওখানকার ছেলেরা তখন মাইক লাগিয়ে জোর গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। হোস্টেলের ভেতর লাল সুরকি ছড়ান রাস্তার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে সবাই। পুলিশ

অফিসারও ততক্ষণে ভার্সিটি এলাকা ছেড়ে দলবল নিয়ে মেডিকেলের চারপাশে জড়ো হয়েছে এসে। একটু পরে হোস্টেলের ভেতরে কয়েকটি কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে মারলো ওরা। মেডিকেলের ছেলেরা বোকা নয়। তারা সব জানে। কাঁদুনে গ্যাসগুলো ফাটবার আগে সেগুলো তুলে নিয়ে পরক্ষণে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারলো তারা। রাস্তার ওপাশে কতগুলো ছোট ছোট রেস্তোরাঁ আর হোটেল ছিলো। পুলিশের কর্তারা তার পেছনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলো। মেডিকেলের পশ্চিম পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এ্যাসেম্বেলি হাউস ছয়ে রেসকোর্সের দিকে চলে গেছে সে রাস্তার মোড়ে, জীপগাড়িসহ জনৈক এম. এল. এ-কে তখন ঘিরে দাড়িয়েছে একদল ছেলে। বেচারা এম. এল. এ তাদের হাতে পড়ে জলে ভেজা কাকের মতো ঠকঠক করে কাপছিলো আর অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলো এদিক সেদিক। আশেপাশে যদি একটা পুলিশও থাকতো। ছেলেরা জীপ থেকে নামালো তাকে। একটা ছেলে তার আচকানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হেঁচকা টানে ছিড়ে ফেললো পকেটটা। আরেকটা ছেলে চিলের মত ছোঁ। মেরে তার মাথা থেকে টুপিটা তুলে রাস্তায় ফেলে দিলো। লোকটা মনের ক্ষোভ মনে রেখে বিড়বিড় করে বললো, আহা করছেন কি? করছেন কি?

আমি আর বরকত মাইকের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বরকত বললো, দাঁড়াও আমি একটু আসি। বলে গেটের দিকে যেখানে ছেলেরা জটলা বেঁধে তখনো শ্লোগান দিচ্ছিলো, সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। সূর্য তখন হেলে পড়েছিলো পশ্চিমে। মেঘহীন আকাশে দাবানল জুলছিলো। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। ডালে ডালে ফাল্গুনের প্রাণবন্যা। অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে গুলির শব্দ হলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। একটা ছেলের মাথার খুলি চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আরেকটি ছেলে যেখানে

দাঁড়িয়েছিলো মুহুর্তে সেখানে লুটিয়ে পড়লো। আরেক প্রস্থ গুলি ছোড়ার শব্দ হলো একটু পরে।

আরেক প্রস্থ। একটা ছেলে তার পেটটাকে দু'হাতে চেপে ধরে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো বার নম্বর ব্যারাকের বারান্দায়। চোখজোড়া তার ফ্যাকাসে হতবিহবল । আরো তিনটি ছেলে বুকে হেঁটে হেঁটে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে এলো। তাদের কারো হাতে লেগেছে গুলি। কারো হাঁটুতে।

বরকতের গুলি লেগেছিলো উরুর গোড়ায়। রক্তে সাদা পাজামাটা ওর লাল হয়ে গিয়েছিলো। আমরা চারজনে ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। পথে সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছিলো। বলেছিলো, তোমরা ঘাবাড়িয়ো না, উরুর গোড়ায় গুলি লেগেছে, ও কিছু না। আমি সেরে যাবো। সে রাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছিলো সে।

অনেকক্ষণ পর কবি রসুল থামালো। কি গভীর বিষাদে ছেয়ে গেছে তার মুখ। একটু পরে বিষাদ দূর হয়ে সে মুখ কঠিন হয়ে এলো।

এনাটমির ক্লাশটা শেষ হতে নার্সেস কোয়াটারে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো সালমা। মালতী তখন স্নান সেরে মাথায় চিরুনি বুলোচ্ছিলো বসে বসে। আসতে দেখে মৃদু হেসে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, বোসো।

সালমা বসলো।

মালতী বললো, ক্লাস থেকে এলে বুঝি?

সালমা সায় দিলো, হ্যাঁ। তারপর বললো, এ মাসের টাকাটা নিতে এলাম। মালতী বললো, বোসো দিচ্ছি। চিরুনিটা নামিয়ে রেখে সুটকেসটা খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করলো মালতী। তারপর নোটটা সালমার হাতে তুলে দিয়ে মালতী চাপা গলায় আবার বললো, আজকে তোমরা রোজা রাখা নি?

রেখেছি।

সবাই?

হ্যাঁ সবাই। তুমি রেখেছে?

হ্যাঁ। চিরুনিটা আবার তুলে নিয়ে বিছানায় এসে বসলো মালতী। আস্তে করে বললো, তোমরা তো তবু ভোর রাতে খেয়েছে। এখানে আমরা যে ক'জনে রেখেছি, ভোর রাতে খেতে পারিনি। জানতো ভাই, চাকরি করি। রোজা রেখেছি শুনলে অমনি চাকরি নট হয়ে যাবে।

বলতে গিয়ে ম্লান হাসলো সে। রওশনের কোন চিঠি পেয়েছে?

পেয়েছি।

কেমন আছে সে?

ভালো।

তোমার দাদা?

গ্যাষ্ট্রিক আলসারে ভুগছে।

এখন কোন জেলে আছেন তিনি?

রংপুর।

একটু পরে মালতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নার্সেস কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো সালমা।

মেডিকেলের গেটে ওর জন্য অপেক্ষা করছে আসাদ। দূর থেকে ওকে দেখলো সে। ওর সঙ্গে একদিনের মেলামেশায় অনেক কিছু জানতে পেরেছে সালমা। ঘরে মা নেই, বাবা আছেন। তিনি খুব ভালো চোখে দেখেন না তাকে। রাজনীতি করা নিয়ে সব সময় গালাগালি দেন। একবার তাকে সাজা দেবার জন্য ইউনিভার্সিটির খরচপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একদিনে তার কাছে অনেক কিছু জানতে পেরেছে সালমা। ছেলেটি জানেশোনে বেশ। কাল ভোর রাতে ভাত খেতে বসে অনেকক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলো। ওর সঙ্গে। ওর কথা

বলার ভঙ্গিটা অনেকটা রওশনের মত। তবে বড় লাজুক। চোখজোড়া সব সময় মাটির দিকে নামিয়ে রেখে কথা বলে।

কাছাকাছি এসে সালমা বললো, আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো, কিছু মনে করবেন না।

না, মনে করার কি আছে। পরীক্ষণে জবাব দিলো আসাদ।

সালমা বললো, সেই ইস্তেহারগুলো মুনিম ভাইকে পৌঁছে দিয়েছেন তো?

আসাদ বললো, দিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সালমা আবার বললো, কাল রাতে পেট ভরে খান নি। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।

খাই নি কে বললো? পেট ভরেই তো খেয়েছি। শুধু শুধু আপনি। চোখজোড়া তখনো মাটিতে নামানো। কথা বলতে গেলে হঠাৎ রওশনের মত মনে হয়, বিশেষ করে ঠোঁট আর চিবুকের অংশটুকু। সালমা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে হাতে তুলে দিলো আসাদ। নিন। যে জন্যে এসেছিলাম। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক কালো ব্যাজ আছে। এর ভেতরে। এতে হবে তো?

হ্যাঁ, হবে। সালমা ঘাড় নাড়লো।

তাহলে আপনার সঙ্গে কাজ আমার আপাতত শেষ। এখন চলি।

রাতে আবার দেখা হবে।

কালো পতাকার কি হলো? পেছন থেকে প্রশ্ন করলো সালমা।

এখনো দর্জির দোকানে। রাতে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তখন পাবেন। বলে দ্রুতপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে গেল আসাদ।

নীলা, বেনু আর ওদের সঙ্গে একটি অপরিচিত মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে, ওদের জন্যে দাঁড়ালো সালমা।

নীলা বললো, কি সালমা, কাল আমাদের হোস্টেলে যাবি বলেছিলে। কই গেলে নাতো? চলো এখন যাবে।

সালমা বললো, যাবার ইচ্ছে ছিলো, সময় করতে পারিনি। ওদের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে ওর নজরে পড়লো নীলা আর বেনুর পরনে দুটো কুচকুচে কালো শাড়ি। বাতাসে শাড়ির আঁচলগুলো পতাকার মত পতপত করে উড়ছে। বাহ চমৎকার।

নীলা অবাক হয়ে তাকালো, কি?

ইশারায় দেখিয়ে সালমা জবাব দিলো, তোমাদের শাড়ি।

হ্যাঁ, নীলা মৃদু হাসলো। কালো ব্যাজ পরা ব্যাণ্ড করেছে। আর তাই আমরা কালো শাড়ি পরেছি। দেখি ওরা আমাদের শাড়ি পরা ব্যান্ড করতে পারে কিনা।

বেনু এতক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবছিলো। আসাদ সাহেবকে আপনি কত দিন ধরে চেনেন?

সালমা ঠিক এ ধরনের কোন প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না। ইতস্তত করে বললো, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তাও পুরো হয় নি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না। এমনি। বেনু দৃষ্টিটা অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে দেখলাম। কিনা, তাই।

কথা বলতে বলতে চামেলী হাউসের কাছে এসে পৌছলো। ওরা। দূর থেকে দেখলো গেটের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সালমা বললো, কেউ এল বোধ হয়।

বেনু বললো, আসে নি, যাচ্ছে।

নীলা বললো, গতকাল অনেকে চলে গেছে হোস্টেল ছেড়ে। কারা রটিয়ে দিয়েছে একুশের রাতে পুলিশ হোস্টেলে হামলা করবে, সে খবর শুনে।

সালমা অবাক হলো, তাই নাকি?

দু'টো সুটকেস আর একটা বেডিং তোলা হলো ছাদের ওপর।

যে মেয়েটা চলে যাচ্ছিলো তার দিকে এগিয়ে নীলা বললো, তুইও চললি বিলকিস?

মেয়েটার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো, চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারলো না সে। শুধু ইশারায়, অদূরে দাঁড়ান ভদ্রলোককে দেখিয়ে আস্তে করে বললো, চাচা এসেছে নিয়ে যেতে। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো তার অসহায়ভাবে।

ইউনিভার্সিটিতে এসে প্রথমে মুনিমের খোঁজ করল আসাদ। ভার্সিটির ভেতরটা কালকের চেয়ে আজকে আরো সরগরম। চারপাশে ছেলেরা জটলা বেঁধে ধর্মঘটের কথা আলোচনা করছে।

এমনি একটা জটলার পাশে এসে দাঁড়ালো আসাদ।

একটা ছেলে বললো, তুমি যা ভাবছো, কিছু হবে না, দেখবে কাল রাস্তায় একটা ছেলেকেও বেরুতে দেবে না ওরা।

আরেকজন বললো, অবাক হবার কিছু নেই। কাল হয়তো কারফিউ দেবে।

তৃতীয়জন বললো, আজকেও কি কম পুলিশ বেরিয়েছে নাকি রাস্তায়।

পল্টনের ওখানে চার-পাঁচ লরী পুলিশ দেখে এলাম।

প্রথম জন ওকে শুধরে দিলো। তুমি যে একটা আস্ত গবেট তাতো জানতাম না মাহেরা আরে, ওগুলো পুলিশ নয়, মিলিটারি। ওখানে তাঁবু ফেলেছে। কাল এতক্ষণে দেখবে পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে পুরো শহরটা ছেয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় জন গভীরভাবে রায় দিলো এবার।

মুনিমের দেখা পেয়ে আসাদ আর দাঁড়ালো না সেখানে।

মধুর রেঁস্তোরার পাশে দাঁড়িয়ে আরেক দল ছেলেকে কি কি যেন বোঝাচ্ছে মুনিম।

তেলবিহীন চুলগুলো দস্যি ছেলের মত নেচে বেড়াচ্ছে কপালে ওপর। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ।

আসাদ বললো, তোমায় খুঁজছিলাম মুনিম।

কেন? কি ব্যাপার? পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো সে।

আসাদ বললো, শুনলাম কাল রাতে তোমাদের বাসায় পুলিশের হামলা হয়েছিলো।

হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ। মুনিম মৃদু হাসলো। অবশ্য ব্যর্থ অভিসার, রাতে বাসায় ছিলাম না।

অদূরে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শুনছিলো সবুর। বললো, তোমার কপাল ভালো, ধরা পড়লে কি আর এ জন্মে ছাড়া পেতে? জেলখানায় পচে মরতে হতো। রাতে কোথায় ছিলে?

বাইরে অন্য এক বাসায় ছিলাম।

বাসায়, না হলো- সবুর মৃদু হাসলো।

না, বাসাতেই ছিলাম। মুনিম ঘাড় নাড়লো।

সবুর বললো, আমাকেও দেখছি আজ রাতে বাইরে কোথাও থাকতে হবে। বাসার আশেপাশে গত ক'দিন ধরে টিকটিকির উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে। মুনিম কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। সহসা সামনের লন দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তে ডলির কথা মনে পড়লো ওর। ডলির সঙ্গে কয়েক মুহুর্তের জন্যে হলেও দেখা করা প্রয়োজন।

সবুরের হাত ঘড়িটার দিকে এক পলক তাকালো মুনিম। এর মধ্যে দুটো বেজে গেলো, আমাকে একটু ভিক্টোরিয়া পার্ক যেতে হবে।

পাগল নাকি? আসাদ রীতিমত চমকে উঠলো। এখন তুমি ইউনিভার্সিটি এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। বাইরে পা দিলেই ধরবে।

ঠিক বলছে আসাদ। রাহাত সমর্থন জানালো তাকে। এখন এ এলাকার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনার। তাছাড়া নবকুমার আর নবাবপুর হাইস্কুলের ছেলেরা একটু পরে দেখা করতে আসবে। আপনি না থাকলে চলবে কি করে?

অগত্যা ডলির সঙ্গে দেখা করার চিন্তাটা মূলতবি রাখলো মুনিম। কিন্তু জাহানারাকে একখানা চিঠি না লিখলে নয়। রাহাতের হাত থেকে খাতাটা আর আসাদের পকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে মধুর রেস্তোরার এককোণে এসে চিঠি লিখতে বসলো মুনিম। গতকাল রাতে আমাদের বাসা সার্চ হয়েছে। খবরটা হয়তো ইতিমধ্যে পেয়েছো। এখন থেকে কিছুদিনের জন্যে বাসায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শুনলাম মা খুব কান্নাকাটি করছেন। মাকে সব কিছু বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভার তোমার উপরে রইলো। আশা করি এ চিঠি পেয়ে তুমি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। আজ রাতে আর তোমাদের ওখানে যাবো না। হোস্টেলে থাকবো।

এখানে এসে চিঠিটা শেষ করেছিলো মুনিম।

পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখলো। কাল রাতে ডলির খবর জানতে চেয়েছিলে, ডলি ভালো আছে।

চিঠিখানা একটা ছেলের মারফত জাহানারার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ গুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো মুনিম। মধুর রেস্তোরায় এখন ভিড় অনেকটা কমে গেছে। কিছু ছেলে এদিকে সেদিকে বসে।

সদরঘাটের মোড়ে কবি রসুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো লেখক বজলে হোসেনের। পরনে একটা ট্রপিক্যাল প্যান্ট, গায়ে লিলেনের সার্ট। পায়ে একজোড়া সদ্য পালিশ করা চকচকে জুতো। লেখক বজলে হোসেন যান্ত্রিক হাসি ছড়িয়ে বললো, আরো রসুল যে, কি খবর, কোথায় যাচ্ছে?

রসুল বললো, এখানে এক দর্জির দোকানে কিছু কালো কাপড় সেলাই করতে দিয়েছিলাম। নিতে এসেছি। তুমি কোথায় চলছে?

আমি? আমার ঠিকানা আছে নাকি। বেরিয়েছি, কোথাও একটু আড্ডা মারা যায় কিনা সেই খোজে। এসো না রিভারভিউতে বসে এক কাপ চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

চা আমি খাব না, রোজা রেখেছি। গভীর গলায় জবাব দিলো রসুল।

তারপর ওর জুতো জোড়ার দিকে কটমট করে তাকালো সে।

বজলে ভ্রু কুঁচকে বললো, রোজা আবার কেন? যতদূর জানি এটা তো রোজার মাস নয়। পরক্ষণে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। ও হ্যাঁ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে, তাই না? বলে শব্দ করে হেসে উঠলো সে। কিন্তু পর মুহুর্তে কবি রসুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে মুখটা পাংশুটে হয়ে গেলো তার। ভয়ে ভয়ে বললো, কি ব্যাপার, অমন করে তাকিয়ে রয়েছে কেন, কি ভাবছো?

তোমার ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

ওর কথা শুনে মুখটা কালো হয়ে গেলো বজলে হোসেনের।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, দেখ রসুল, আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক, মিছিল কি শোভাযাত্রা বের করে, পুলিশের লাঠি গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের এক একটা প্রতিভার মৃত্যু। নিজের জ্ঞানগর্ভ ভাষণে অশেষ তৃপ্তি বা েধ করলো বজলে হোসেন।

ওর কথাটা শুনে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠলো কবি রসুলের। আশ্চর্যভাবে রাগটা সামলে নিয়ে বললো, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই নে বজলে। আমার এখন কাজ আছে।

আমারও অনেক কাজ, বলে আর এক মুহুর্তও সেখানে দাঁড়ালো না বজলে, চায়ের নেশা পেয়েছে ওর। রিভারভিউতে যাবে।

রিভারভিউতে বসে এক কাপ চা আর একটা চপ খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো সে। ডলির সঙ্গে এনগেজমেন্ট আছে। ভাবতে এখনো অবাক লাগে বজলের, কাল হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ডলি ওর কাছে ধরা দিলো কেন? একি ওর ক্ষণিক দুর্বলতা না বজলেকে সে অনেক আগে থেকে ভালবাসতো? হয়তো কোনটা সত্য নয়। হয়তো প্রথমটা সত্য। কাল রাতে সিনেমা দেখে ফেরার পথে ডলি যেন বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ঈষৎ কান্ত হয়ে মাথাটা রেখেছিলো। ওর কাধের ওপর।

বজলে ওকে আলিঙ্গন করতে চাইলে ডলি বাধা দিয়ে বলেছিলো, না।

এখন আমায় এমনি থাকতে দাও বজলে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলো, কাল যদি তোমাকে ডাকি। বেড়াতে বেরুবে তো আমার সঙ্গে?

একটু ভেবে নিয়ে ডলি জবাব দিয়েছিলো, হ্যাঁ, বেরুবো, বিকেলে যদি পারো বাসায় এসো।

বাসায় এসে বজলে দেখলো ডলি আগে থেকে সেজেগুজে বসে আছে।

পরনে একটা মেরুন রঙের শাড়ি। গায়ে একটি সাদা ব্লাউজ। চুলে আজ খোপা বাঁধে নি ডলি, বিনুনী করে ছেড়ে দিয়েছে পিঠের উপর।

বজালেকে দেখে মৃদু হাসলো ডলি।

বজলে বললো, তুমি দেখছি তৈরি হয়ে বসে আছো। চলো।

ডলি বললো, চা খাবে না?

বজলে বললো, খাবো, তবে ঘরে নয়। বাইরে।

রাস্তায় নেমে ডলি জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে?

হাতের ইশারায় একখানা রিক্সা থামিয়ে জবাব দিলো, একবার রিক্সায় ওঠা যাক তো। তারপর দেখা যাবে।

রিক্সায় উঠে কিছুক্ষণ লক্ষ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগলো ওদের। রেস্তোরায় বসে দু'কাপ কফি আর কিছু প্যাস্ট্রি খেলো।

বজলে সিনেমা দেখার পক্ষে ছিলো। ডলি নিষেধ করলো, রোজ সিনেমা দেখতে ভাল লাগেনা ওর। তার চেয়ে শহরতলীতে কোথাও বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না।

বজলে বললো, দি আইডিয়া।। চলে যাওয়া যাক।

ডলি বললো, চলো।

খানিকক্ষণ পর বজলে আবার বললো, সন্ধের পর মাহমুদের ওখানে যাবার কথা আছে।

তুমি যাবে তো?

ডলি বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলো, আমি কেন ওর ওখানে যাবো?

বজলে ওর একখানা হাত ধরে নরম গলায় বললো, ওখানে কেউ থাকবে না, ডলি।

আমরা নিরিবিলিতে গল্প করবো।

ডলি ঈষৎ লাল হয়ে বললো, না।

বিকেলে চা খেতে বসে শাহেদ প্রশ্ন করলো, কাল রাতে আমার বিছানায় যে শুয়েছিলো, লোকটা কে-রে আপা?

আসাদ সাহেব। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

তোমাদের দলের লোক বুঝি?

না।

ইস, না বললেই হলো। আমি দেখলে চিনি নে যেন।

চিনেছো, ভাল করেছে। এখন চুপ করো।

কেন চুপ করবো? শাহেদ রেগে উঠলো। লোকটার জ্বালায় কাল রাতে একটুও ঘুমোতে পেরেছি নাকি? ঘুমের ভেতর অমন হাত-পা নাড়তে আমি জন্মেও দেখি নি কাউকে। মাঝ রাতে ইচ্ছে করছিলো জানালা গলিয়ে, বাইরে ফেলে দিই লোকটাকে।

ওর কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো সালমা।

শাহেদ বললো, তুই হাসছিস? আমার যা অবস্থা হয়েছিলো তখন, শুধু কি হাত-পা ছুড়ছিলো লোকটা? ঘুমের ঘোরে কি যেন সব বলছিলো বিড় বিড় করে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার। উঠছিলো, উহা কেমন করে যে রাতটা কেটেছে আমার।

হাসতে গিয়ে মুখে আঁচল দিলো সালমা। বললো, দাঁড়াও না, আজ রাতেও তোমার ওখানে থাকবে সে।

আজকেও থাকবে বুঝি? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শাহেদ। তুই কি আমায় ঘর থেকে তাড়াতে চাস আপা?

কেন, তোমার যদি ওখানে ঘুম না আসে তাহলে আলাদা বিছানা করে দেবো সেখানে থেকে।

তাহলে তাই করে দিস। শাহেদ শান্ত হলো।

ওর মাথার চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে সালমা একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে, আমার কোন চিঠিপত্র এসেছে?

সাহেদ সংক্ষেপে ঘার নাড়লো, না।

শুনে বিমর্ষ হয়ে গেলো সালমা। রওশনের শেষ চিঠি পেয়েছে সে অনেক দিন। এতো দেরি তো কোনবার হয় না। সালমার মনে হলো হয়তো তার অনেক অসুখ করেছে। না হলে চিঠি লিখছে না কেন?

ভাবতে গিয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলে ওর।

তখন না বলেও মাহমুদের ওখানে যেতে হলো ডলিকে।

সাহানাকে নিয়ে মাহমুদ তখন বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছিলো।

ওদের দেখে খুব খুশি হলো সে। বললো, তোমরা এসেছে বেশ ভাল হলো। চলো এক সঙ্গে বেরোন যাবে।

বজলে শুধালো, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

মাহমুদ বললো, সাহানা যাবে ওর এক বান্ধবীর বাসায় আর আমি একটা অফিসিয়াল কাজে।

মাহমুদকে ঈশারায় এক পাশে ডেকে নিয়ে এলো বজলে। তারপর ধমকের সুরে বললো, তুমি একটা আস্ত গবেট। ডলিকে নিয়ে এখানে এসেছি কেন এ সামান্য ব্যাপারটা বোঝা না? বলে মুচকি হাসলো সে।

ক্ষণকাল ওর দিকে তাকিয়ে মাহমুদ কাধে ঝাকালো। মৃদু হেসে হেসে বললো, বুঝেছি। তারপর ডলির দিকে এগিয়ে গেলো সে। আপনারা এখানে বসে গল্প করুন। আমি সাহানাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি। বলে আড়চোখে বজলের দিকে তাকালো সে।

ডলি ব্যস্ততার সঙ্গে বললো, আপনারা কতক্ষণে ফিরবেন?

মাহমুদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো, এইতো যাবো। আর আসবো।

সাহানা অকারণে হাসলো একটু।

ডলি সে হাসির কোন অর্থ খোজে পেলো না।

ওরা চলে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো বজলে।

ঘরে এখন ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। এখন ইচ্ছে করলে নির্বিঘ্নে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারবে ওরা।

ডলির পাশে এসে বসলো বজলে। তারপর দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিলো। ডলি বিরক্তির সঙ্গে বললো, একি হচ্ছে?

বজলে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললো, এখন আর আমায় বাধা দিয়ো না ডলি।

ডলি কপট হেসে বললো, এই জন্যে বুঝি আসা হয়েছে এখানে?

বজলে বললো, হ্যাঁ, এই জন্যে। ডলিকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলো সে। ডলি এবার আর বাধা দিলো না।

রাত আটটা বাজবার তখনো কিছু বাকি ছিলো। আকাশের ক্যানভাসে সোনালি তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। কুয়াশা ঝরছে। উত্তরের হিমেল বাতাস বইছে ধীরে ধীরে।

শাহেদের হাত ধরে ছাদে উঠে এলো সালমা।

ছোট্ট ছাদ।

আরো অনেকে তখন আশেপাশের ছাদে উঠে গল্প করছিলো বসে বসে। সালমা শুনলো, রাজ্জাক সাহেব তার গিন্নীকে বলছেন, দেখো আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। কাল ছেলেমেয়েদের কাউকে বাইরে বেরুতে দিয়ে না। না, না, যেমন করে হোক। ওদের আটকে রেখে ঘরের মধ্যে। কে জানে কাল কি হয়। হয়তো সেবারের মত গুলি চালাবে ওরা।

শুধু রাজ্জাক সাহেব নন। সবার মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। কাল নিশ্চয় কিছু একটা ঘটবে। কি ঘটবে কে জানে। হয়তো রক্তপাত হবে। প্রচুর রক্তপাত। সালমা শুনলো, রাজ্জাক সাহেবের গিনী প্রশ্ন করলেন, আর কত এসব চলবে বলতো? রাজাক সাহেব জবাব দিলেন, জানি না।

কেউ জানে না কতকাল এমনি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে ওদের থাকতে হবে। এমনো সময় এসেছে মাঝে মাঝে, যখন মনে হয়েছে, এবার বুঝি তারা শান্তির নাগাল পেলো। কিন্তু পরীক্ষণে তাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। হিংসার

নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ওরা। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছে, আর পারি না।

সালমা শুনলো, রাজাক সাহেব বলছেন, কতকাল চলবে সে কথা ভেবে কি হবে। তুমি ছেলে-মেয়েগুলোকে কাল একটু সামলে রেখো।

গিন্নী বললেন, রাখবো।

আর এমনি সময় অকস্মাৎ সমস্ত শহর কাঁপিয়ে অজুতকণ্ঠের শ্লোগানের শব্দে চমকে উঠলো সবাই। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলো, কি হলো, ওরা কি গুলি চালালো আবার?

আকাশে মেঘ নেই। তবু ঝড়ের সংকেত।

বাতাসে বেগ নেই। তবু তরঙ্গ সংঘাত।

কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।

যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে দিগ্বিদিক।

শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

সবাই বুঝলো। বুঝতে কারো বেগ পেতে হলো না। রাস্তায় শ্লোগান দেয়া নিষেধ। মিছিল শোভাযাত্রা বেআইনী করেছে সরকার। আর তাই ঘরে ঘরে ছাতের উপরে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা, ছাত্ররা। মুসলিম হল, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, ইডন হোস্টেল, নূরপুর ভিলা। সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নাই।

সালমার হাতে একটা টান দিয়ে শাহেদ বললো, গত ইলেকশনের সময় তোরা শ্লোগান দিয়েছিলি ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে তাই না। আপা?

হ্যাঁ। সালমা সংক্ষেপে জবাব দিলো।

শাহেদ বললো, কি লাভ হয়েছে তোদের। যাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিস তারা তো এখন কিছুই বলছে না।

উত্তরে সালমা কিছু বলবে ভাবছিলো। শুনলো রাজ্জাক সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন, সবাই তো আর মীরজাফর নয়। ভাল লোকও আছে।

আসল কথা হলো, কে ভালো আর কে মন্দ সেটা যাচাই করে নেয়া, বুঝলে?

অনেকক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা করছিলো মাহমুদের। একটা চেয়ার খালি হতে তাড়াহুড়া করে বসে পড়লো সে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলো ন'টা বেজে গেছে প্রায়।

এতক্ষণ কিউ খানের একটানা প্রলাপ শুনতে হয়েছে। বড় কর্তার ধমক খেয়ে লোকটা রেগেছে ভীষণ। এইতো একটু আগে ইনন্সপেক্টারদের সবাইকে ডেকে অবস্থা জানালেন তিনি। আমি জানতাম আপনাদের দিয়ে কিছু হবে না। আপনারা শুধু গায়ে বাতাস দিয়ে বেড়াতে পারেন।

বড় কর্তা বললেন, কি আশ্চর্য। আপনাদের কাজের নমুনা দেখলে আমার গা জ্বালা করে ওঠে। এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, অথচ আপনারা কিছুই করতে পারছেন না।

একজন পুলিশ অফিসার হাত কচলে বললো, আমরা কি করবো স্যার?

ওরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে। আমরা হুকুমের দাস। আমরা কি করবো স্যার? আপনারা কি করবেন মানে? বড় কর্তা ভ্র কুঁচকে বললেন, আপনারাই তো সব কিছু করবেন। আপনারা হচ্ছেন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। দেশ তো আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বড় কর্তার কথা শুনে মাহমুদ অবাক

দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো তাঁর দিকে। আর ভাবছিলো, সত্যি লোকটা একটা জিনিয়াস। মানুষকে কি শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। আমাদের প্রতি তার কি গভীর মমতাবোধ। বড় কর্তা আবার বললেন, আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন, গুটিকয় বিদেশের দালাল আমাদের সোনার দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশ করছে আমাদের।

তাঁর কথায় একজন অফিসার উৎসাহিত হয়ে বললো, ইয়ে হয়েছে স্যার। কি যে বলবো। যেখানে যাই, সেখানে দেখি ছেলে-ছোকরা েরা সব জটলা বেঁধে কি সব ফুসুরফাসুর করছে। জানেন স্যার, লোফার এই খবরের কাগজের হকার বলুন, রিক্সাওয়ালা বলুন, এমন কি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও কেমন একটা সন্দেহের ভাব দেখলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র করছে ওরা।

ওহে। দেশটা একেবারে রাষ্ট্রদ্রোহীতে ভরে গেছে। কিউ. খানের চোখে মুখে হতাশার ছাপ।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

সাহানা ওর জন্যে দাড়িয়ে থাকবে গুলিস্তানের সামনে। তাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে হবে। বজলে আর ডলি এখনো অপেক্ষা করছে।

স্লোগান দিবার চোঙাগুলো একপাশে এনে জড়ো করে রাখলে ওরা। এতক্ষণ ছাদের ওপরে উঠে একটানা অনেকক্ষণ স্লোগান দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সবাই। এই শীতের মরশুমেও গা বেয়ে ঘাম করছে। গলা ফেটে গেছে। স্বরটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

মুনিম বললো, গরম পানিতে নুন দিয়ে গার্গেল করো, ভালো হয়ে যাবে। নইলে ব্যথা করবে। গলায়। কাল আর কথা বেরুবে না।

কয়েকজন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। ওরা বিছানায় এলিয়ে পড়লো। কেউ কেউ কাল দিনে কি ঘটতে পারে। তাই নিয়ে জোর আলোচনা শুরু করলো

করিডোরে। কেউ ডাইনিং হলে খেতে গেলো। খাবার টেবিলেও তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনার শেষ নেই।

মাঝখানের মাঠটায়, যেখানে সুন্দর ফুলগাছের সার থরে থরে সাজানো, ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসলো মুনিম। অনেক চিন্তার অবসরে ডলির কথা মনে পড়লো ওর। ডলির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হতো। মুনিম ভাবলো। কিন্তু পরীক্ষণে আরেক চিন্তায় ডলি হারিয়ে গেলো মন থেকে। রাত শেষে ভোর হবে। আর পুলিশ এসে হয়তো ঘিরে ফেলবে পুরো হলটাকে। এমনি ঘিরেছিলো আরেকবার। বায়ান্ন সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারিতে। তখন এই হলটাই ছিলো আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। সেদিনের কথা ভাবতে অবাক লাগে মুনিমের। রীতিমত একটা সরকার চালাতে হয়েছিল ওদের। বজলুর পঁচিশ নম্বর রুমটা ছিলো অর্থ দপ্তরের অফিস। দোরগোড়ায় লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা ছিলো- অর্থ দপ্তর। ছেলেরা টাকা সংগ্রহের জন্যে কোটা হাতে বেরিয়ে যেতো ভোরে ভোরে। রাস্তায় আর বাসায় বাসায় চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতে ওরা। দুপুরে কৌটো ভরা আনি দুয়ানি আর টাকা এনে জমা দিতো অফিসে। আন্দা েলনের যাবতীয় খরচপত্র সেখান থেকে চালানো হতো। বজলু ছিলো এই দপ্তরের কর্তা। অর্থনীতিতে খুব ঝানু ছিলো বলে ওই পদটা দেয়া হয়েছিলো। ওকে। নিশু ছিলো। ওর হেড কেরানী। কেরানীর মতই মনে হতো। ওকে।

অর্থ দপ্তরের পাশে ছিলো ইনফরমেশন বুঢ়ারো। ওদের কাজ ছিলো কোথায় কি ঘটছে তার খবর সংগ্রহ করা। ভোর হতে সাইকেলে চড়ে এই ক্ষুদে গোয়েন্দার দল বেরিয়ে পড়তো শহরের পথে। কোথায় ক'জন গ্রেপ্তার হলো, কোথায় অধিক সংখ্যক পুলিশ জমায়েত হয়েছে, কোন জায়গায় এখন হামলা চলার সম্ভাবনা আছে এসব খোঁজ নিতো ওরা।

আর কোন খোঁজ পেলে তক্ষুণি হেড অফিসে এসে খবরটা পৌছে দিতো। এছাড়া আরো কয়েকটা কাজ ছিলো। ওদের। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়

খবর আদান-প্রদান করা, সরকারী গোয়েন্দাদের ওপর নজর রাখা, আর নিজেদের মধ্যে কোন স্পাই আছে কিনা, সেখানে দৃষ্টি রাখা। ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্মকর্তা ছিলো আরজান ভাই। বড় ধুরন্ধর ছিলো লোকটা। দু'জন সরকারী গোয়েন্দাকে হলের মধ্যে ধরে কি মারটাই না দিয়েছিলো সে। ইনফরমেশন বুঢ়ারোর পাশে ছিলো প্রচার বিভাগের অফিস। তার পাশে খাদ্য দপ্তর। ওদের কাজ ছিলো জেলখানায় আটক বান্দিদের খাবার সরবরাহ করা। কেন্দ্রীয় দপ্তরটা ছিলো মনসুর ভাইয়ের রুমে। যেখানে বসে আন্দা েলন সম্পর্কে মূলনীতি নির্ধারণ করা হতো। সেই মতে চলতো সবাই।

বিকেলে অফিস-আদালত থেকে কারখানা আর বস্তি থেকে হাজার হাজার লোক এসে জমায়েত হতো হলের সামনে। প্রচার দপ্তর থেকে মাইকের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হতো ওদের।

তারপর তারা চলে যেতো। বসে বসে সে দিনগুলোর কথা ভাবছিলো মুনিম। ভাবতে বেশ ভাল লাগছিলো ওর। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বললো, এখানে কুয়াশার মধ্যে বসে আছেন কেন, উঠুন মুনিম ভাই। আপনার জন্যে ভাত নিয়ে এসেছি। রুমে। মুনিম উঠে দাঁড়ালো চলো।

সাহানাকে নিয়ে বেশ রাত করে বাসায় ফিরে এলো মাহমুদ। প্রায় রাতে এমনি দেরি হয় ওর। কোনদিন কাজ থাকে। কোনদিন ক্লাবে যায়। আর রেস্তোরায় বসে আড্ডা মারে। জীবনটা হলো একটা সুন্দর করে সাজানো বাগানের মত। যেদিকে খুশি ইচ্ছেমত উড়ে যেতে পারো তুমি। কিম্বা কখনো ভ্রমর হয়ে উড়ে বেড়াতে পারো এক ফুল থেকে অন্য ফুলে।

সাহানার বাহুতে স্পর্শ করে মাহমুদ বললো, সাহানা তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই না?

সাহানা চোখ তুলে শুধু একবার তাকালো ওর দিকে। তারপর সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

মাহমুদ জানতো, কি উত্তর দেবে সাহানা। অতীতে এমনি আরো অনেককে প্রশ্ন করে ওই একই জবাব পেয়েছে সে। আগে রোমাঞ্চিত হতো। আজকাল আর তেমন কোন সাড়া জাগে না মনে। তবু, আবার জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ, সত্যি ভালবাস।

সাহানা হেসে জবাব দিলো, জানি না।

আমি জানি, মাহমুদ কেটে কেটে বললো। আমি জানি, একদিন তুমি বাবুই পাখির মত পলকে উড়ে চলে যাবে।

সাহানা রক্তাভ হলো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, তাই যাবো। একজনের কাছে বেশি দিন থাকতে ভালো লাগে না আমার।

গলার স্বরে তার শ্লেষ আর ঘৃণা।

মাহমুদের মনে হলো মেয়েটি বড় নির্লজ্জ। ঠোঁটের কোণে কথাটা একটুও বাধলো না ওর। কি নির্বিকার ভাবেই না বলে গেলো।

মাহমুদ নিজেও ওকথা বলেছে অনেককে।

সালেহাকে মনে পড়ে। টালি ক্লার্কের মেয়ে সালেহা। মেয়েটা রীতিমত ভালবেসে ফেলেছিলো ওকে।

বোকা মেয়ে।

ওর কথা ভাবলে দুঃখ হয় মাহমুদের। অমন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা না করলেও পারতো সে।

কিন্তু সাহানা ওর মত বিষ খাবে না। খুব স্বাভাবিকভাবে সব কিছু নিতে পারবে সে। তবু মাহমুদের কেন যেন আজ মনে হলো মেয়েটা বড় নির্লজ্জ।

ভেতরে বাতি নেভানো ছিলো। কড়া নাড়তে গিয়ে দু'জনের চোখে চোখ পড়লো। মুখ টিপে এক টুকরো অর্থপূর্ণ হাসি ছড়ালো সাহানা। মাহমুদও না হেসে পারলো না। খানিকক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। তারপর বাতি জ্বলে উঠলো। শব্দ হলো কপাট খোলার। খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বজলে।

পরিপাটি চুলগুলো এলোমেলো। মুখে ঈষৎ বিরক্তির আমেজ। ওদের দেখে বললো, কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

মাহমুদ হাত ঘড়িটা ওর মুখের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে করে বললো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরি নি কিন্তু।

বজলে লজ্জা পেয়ে বললো, একি, দুঘণ্টা!!আমার মনে হচ্ছিলো--।

আমারো তেমনি মনে হলো। ডলির দিকে আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে শব্দ করে হাসলো মাহমুদ।

নীল আলো ছড়ানো ঘরের দেয়ালে একটা টিকটিকি টিক টিক শব্দে ডেকে উঠলো।

কৌচের উপর বসে দেহটা এলিয়ে দিল মাহমুদ। আলনা থেকে তোয়ালেটা নাবিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো সাহানা। ডলি দাঁড়িয়েছিলো। উত্তরমুখো আলমারিটার পাশে, জানালার ধার ঘেঁষে ওদেরকে পেছন করে।

মাহমুদ বললো, কাল সকালে কি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে বজলে?

বজলে প্রশ্ন করলো, কেন বলতো?

মাহমুদ বললো, কিছু আলাপ ছিলো।

বজলে শুধালো, গোপনীয় কিছু?

মাহমুদ ঘাড় নাড়লো। না, ঠিক গোপনীয় কিছু নয়।

বজলে এগিয়ে এসে বসলো তার সামনে। কাল কেন, এখন বল না।

মাহমুদ বললো, না, এখন না। কাল সকালে বরং একবার এখানে এসো তুমি, কেমন?

জানালার পাশে দাঁড়ানো ডলি ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছিলো বাইরে।

সার সার বাতি। গাড়ি আর লোকজন। সবকিছু বড় অস্বস্তিকর মনে হলো তার। যেন এমন একটা নিরিবিলি অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকোতে পারলে সে

বেঁচে যায়। পেছন ফিরে তাকাতে ভয় হচ্ছে ওর। যদি মাহমুদের চোখে চোখ পড়ে তাহলে? সত্যি ওরা কি ভাবছে, কে জানে। ডলি রীতিমত ঘামতে শুরু করলো।

বাইরে বেরিয়ে যখন রিক্সায় উঠলো। ওরা, তখন ইলশেগুড়ির মত বৃষ্টি ঝরছে। ডলি অনুযোগের সুরে বললো, আজ আমাকে এতবড় একটা লজ্জা না দিলে চলতো না?

বজলে অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কোথায় লজ্জা দিলাম তোমায়?

ডলি ঈষৎ রক্তাভ হয়ে বললো, জানি না।

ডলির হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো বজলে। চোখজোড়া ওর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বাইরে গাড়ি ঘোড়া আর লোকজন দেখতে লাগলো ডলি।

রাস্তায় তেমন ভিড় নেই, যানবাহন চলাচল অনেক কম। পথের দু'পাশে দোকানগুলোতে খন্দিরের আনাগোনা খুব বেশি নয়। সহসা ডলি চমকে উঠলো। মনে হলো ওদের রিক্সার পাশ ঘেষে মুনিম সাইকেল নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। কোথায় গেলো সে?

কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো ডলি। এমনো হতে পারে যে, আজ বাসায় ফিরে দেখবে মুনিম তার অপেক্ষায় বসে আছে। ডলিকে কাছে পেয়ে হয়তো বলবে, অনেক ভেবে দেখলাম ডলি, তোমাকে বাদ দিলে জীবনে আর কিছুই থাকে না। তাই সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে ফিরে এলাম। আমাকে ক্ষমা করে দাও। বলে কাতর চোখজোড়া তুলে ওর দিকে তাকাবে সে। ডলি তখন কি উত্তর দেবে?

ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠলো ডলি। কিন্তু পরীক্ষণে মনে হলো এ তার উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। মুনিমকে সে দেখেনি, ওটা চোখের ভুল। এ

তিনদিন ওরা খালি পায়ে হাঁটাচলা করছে। সাইকেলে নিশ্চয় চড়বে না মুনিম। ভাবতে গিয়ে কেন যেন বড় হতাশ হলো ডলি।

বজলে ওর হাতে একটা নাড়া দিয়ে বললো, কি ব্যাপার চুপচাপ কি ভাবছো?

ডলি আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, না, কিছু না। তারপর অনেকটা পথ চুপ থেকে সহসা প্রশ্ন করলো, ওরা স্বামী-স্ত্রী তাই না?

ওরা কারা? কাদের কথা বলছে? বজলে অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। ডলি বললো, সাহানা আর মাহমুদ।

বজলে কি ভেবে বললো, হ্যাঁ, ওরা স্বামী-স্ত্রী। এই তো মাস কয়েক হলো বিয়ে হয়েছে তাদের। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

না, এমনি। বজলের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো ডলি।

সারারাত এক লহমার জন্যে ঘুমোল ওরা।

মেডিকেল হোস্টেল, মুসলিম হল, চামেলী হাউস, ইডেন হোস্টেল, ফজলুল হক হল, সতর্ক প্রহরীর মত সারারাত জেগে রইল। ওরা।

কেউবা জটলা বেঁধে কোরাসে গান গাইলো, ভুলবো না, ভুলবো না, একুশে ফেব্রুয়ারি। কেউ গাইলো, দেশ হামারা। ফজলুল হক হলটাকে বাইরে থেকে দেখতে মোঘল আমলের দুর্গতদের মত মনে হয়। আস্তরবিহীন ইটের দেয়ালগুলো রক্তের মত লাল।

তিনতলা দালানটা চৌকোণো, মাঝখানে দুর্বঘাস পাতা প্রশস্ত মাঠ।

দু'পাশে বাগান।

মাঠের ওপর ছেলেরা কাগজের স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে বসলো। বাঁশের কঞ্চি এলো। কাগজ এলো। রঙ তুলি সব কিছু নিয়ে কাজে লেগে গেলো। ওরা। অদূরে

কালো পতাকা আর কালো ব্যাজ বানাতে বসলো আরেক দল ছেলে। ঘন অন্ধকারে ছায়ার মত মনে হলো ওদের।

তিনতলা থেকে কে একজন ডেকে বললো, একটু অপেক্ষা করো, আমরা আসছি।

অপেক্ষা করার সময় নেই, নিচে থেকে কবি রসুল জবাব দিলো।

রাতারাতি শেষ করতে হবে সব। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

আরেকজন বললো, আসতে আঠার টিনটা নিয়ে এসো মাহের।

এমনি, আরো একটা রাত এসেছিলো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

পরিকল্পনাটা প্রথমে আলীম ভাই-এর মাথায় এসেছিলো।

রাতারাতি একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়বা ে আমরা।

চমৎকার। শুনে সায় দিয়েছিলো সবাই।

মেডিকেল হোস্টেলের চারপাশে তখন জমাট নিস্তব্ধতা। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার চলাচল নেই। আকাশমুখী গাছগুলো কুয়াশার ভারে আনত।

একে একে ছেলেরা সবাই বেরিয়ে এলো ব্যারাক ছেড়ে।

প্রথমে একটা জায়গা ঠিক করে নিলো ওরা।

শহীদ রফিকের গুলিবিদ্ধ খুলিটা চরকীর মত ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়েছিলো, যেখানে দাঁড়িয়ে বরকত তার জীবনের শেষ কথাটা উচ্চারণ করেছিলো, ঠিক হলো সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ গড়বে ওরা।

সেখান থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে, মেডিকেল কলেজের একটা বাড়তি ঘর তোলার জন্যে ইট রাখা হয়েছিলো স্তুপ করে। এই তিনশ' গজ পথ। সার বেঁধে দাঁড়াল ছেলেরা। তারপর হাতে হাতে, এক ঘণ্টার মধ্যে চার হাজার ইট সেখান থেকে বয়ে নিয়ে এলো ওরা। স্টোর রুমের তালা খুলে তিন বস্তা সিমেন্ট

বের করা হলো। দু'জন গিয়েছিলো রাজমিস্ত্রী আনতে। চকবাজারে। সেই শীতের রাতে অনেক তালাশ করে মিস্ত্রী নিয়ে ফিরে এলো ওরা।

সারারাত কাজ চললো।

পরদিন সমস্ত দেশ অবাক হয়ে শুনলো সে খবর।

তারপর।

তারও দিন চারেক পরে আরো একটা খবর শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো সবাই। সরকারের মিলিটারি এসে স্মৃতিস্তম্ভটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু, ছেলেরা দমেনি। ধুলোয় মেশানো ইটের পাজারগুলোকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলো ওরা। কয়েকটা গন্ধরাজ আর গাঁদা ফুলের চারা লাগিয়ে দিয়েছিলো ভেতরে।

এসব তিন বছর আগের কথা।

সে রাতে মেডিকেলের ছেলেরা কাপড় দিয়ে কঞ্চির ঘেরটা ঢেকে নিলো সযত্নে। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে অজস্র ফুলে ভরিয়ে দিলো বেদী।

তারপর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইলো ওরা, শহীদের খুন ভুলবো না।

বরকতের খুন ভুলবো না।

কাগজ দিয়ে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শেষ করে ছেলেরা অনেকে কবি রুসলের রুমে বিশ্রাম নিতে এলো। রাহাত আর মাহের হাত-পা ধুয়ে ধাপ করে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। উঃ এই শীতের ভেতরেও গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেছে। রাহাত হাই তুললো।

মাহের বললো, একটা সিগারেট খাওয়ানা রসুল ভাই। আছে?

না, নেই। কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বের করে জবাব দিলো রসুল।

বিকেল থেকে শরীরটা জ্বর জ্বর করছিলো ওর। এখন আরো বেড়েছে। কিন্তু সেটা ও জানতে দেয় নি কাউকে। ওর ভয়, যদি জুরের খবরটা সবাই

জেনে যায় তাহলে ঘর ছেড়ে এক পাও বাইরে বেরুতে দেবে না। ওকে। উহ! এমন দিনেও কেউ ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে পারে।

নড়েচড়ে শুতে গিয়ে ওর গায়ে হাত লাগতে রাহাত চমকে উঠলো।

একি রসুল ভাই, তোমার জ্বর এসেছে?

এই সামান্য জ্বর।

ইস! গা দেখছি পুড়ে যাচ্ছে, আর তুমি বলছে সামান্য। রাহাত উঠে বসে কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দিল ওর।

মাহের বললো, আমি ঘুম দিলাম রাহাত। ভোর রাতে ব্লাক ফ্ল্যাগ তোলার সময় আমায় জাগিয়ে দিয়ো।

এখন আবার ঘুমোবো কি? রাহাত কোন উত্তর দেবার আগে আরেকজন বললো। একটু পরেই পতাকা তোলার সময় হয়ে যাবে। তারচে' এসো গল্প করি।

সেই ভালো। মাহের উঠে বসলো, কিন্তু একটু ধুয়ো না পেলে জমছে না। আছে নাকি কারো কাছে, থাকলে এক-আধটা দাও।

আহ, তুমি জ্বালিয়ে মারলে। কে একজন বলে উঠলো, নাও টানো।

সিগারেটটা ধরিয়ে একটা তৃপ্তির টান দিলো মাহের। তারপর একটা গল্প বলতে শুরু করলে সে।

ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলো সালমা। এলার্মের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। গায়ের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো।

বাতিটা জ্বালিয়ে কলগোড়া থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন চুলগুলোর মধ্যে মৃদু চিরুনি বুলিয়ে নিলো সালমা। খাটের তলা থেকে স্টোভটা টেনে নিয়ে আগুন ধরালো। ঠাণ্ডায় হাত-পা কঁপিছিলো। আগুনের পাশে বসে গা-টা একটু গরম করে নিলো সে। তারপর চায়ের কেতলিটা আগুনে তুলে দিয়ে আসাদকে ডাকতে গেলো।

দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে বড় সঙ্কোচ হচ্ছিলো সালমার। দরজা খুলে দেখলো, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে আসাদ। বালিশের ওপর থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে বিছানার ওপর। চোখে তার গাঢ় ঘুম। কি নাম ধরে ডাকবে, সালমা ভাবলো। আসাদ সাহেব, না আসাদ ভাই।

অবশেষে ডাকলো, এই শুনছেন। চারটা বেজে গেছে, শুনছেন?

শোনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সালমা ভাবলো শাহেদকে দিয়ে জাগাবে ওকে। কিন্তু এতো রাতে শাহেদকে জাগানো বিপদ। যেমন ব্লগচটা ছেলে, রেগে গিয়ে আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

সালমা আবার ডাকলো, এই যে, শুনছেন। চারটে বেজে গেছে।

শুনছেন?

আহ্ কি হচ্ছে এই রাতের বেলা। সহসা রেগে গেলো আসাদ। তার চোখেমুখে বিরক্তি।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুলো সে। সালমা মুখ টিপে হাসলো। আচ্ছা বিপদ তো লোকটাকে নিয়ে। এই যে শুনছেন? কাঁধের পাশে জোরে একটা ধাক্কা দিলো সালমা।

ধড়ফড় করে এবার বসলো আসাদ। কি ব্যাপার কাটা বাজে?

চারটা। সালমা ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি তো বেশ ঘুমোতে পারেন? উঠুন, চটপট হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি যাই চায়ের পানিটা নামাই গিয়ে কেমন? মিষ্টি করে হাসলো সালমা।

যান, আমি আসছি। আসাদের চোখেমুখে তখনও ঘুমের অবসাদ। জড়ানো গলায় বললো, উহা কি শীত। হাত-পা সব ঠকঠক করে কাঁপছে।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিন। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। যাবার সময় বলে গেলো সালমা। ঘুমে তখনো চোখজোড়া বার বার জড়িয়ে আসতে চাইলো তার। তবু

চাদরটা গায়ে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আসাদ। চটিজোড়া খাটের তলা থেকে বের করে নিয়ে পরলো।

বারান্দায় বালতি ভরা পানি ছিলো। পানিতে হাত দিতে গিয়ে ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলো। সে। উত্তর থেকে আসা ঈষৎ ভেজা বাতাস দেয়ালের গায়ে প্রতিহত হয়ে অদ্ভুত একটা শব্দের সৃষ্টি করছে। সে শব্দ অনেকটা যেন হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে কানে।

ও ঘর থেকে সালমা শুধালো, আপনার হাত-মুখ ধোয়া হলো আসাদ সাহেব? এইতো হলো।

ঘরের মধ্যে আর কোন আলো নাই। অন্ধকারে শুধু স্টোভটা জ্বলছে, মাঝখানে। তার পাশে বসে স্থির চোখে কেতলিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সালমা। দেয়ালে বড় হয়ে একটা ছায়া পড়েছে তার। দোরগোড়ায় মুহুর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো আসাদ। হঠাৎ দেয়ালের ছায়াটাকে অদ্ভুত সুন্দর বলে মনে হলো ওর।

নিঃশব্দে স্টোভটার কাছে এসে বসলো আসাদ। আপনার কি খুব শীত লাগছে? এক সময় আস্তে করে সালমা শুধালো। স্টোভের আরো একটু কাছে সরে এসে আসাদ বললো, সত্যি ভীষণ শীত পড়েছে। হাতজোড়া বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখুন। বলে হাত দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিলো আসাদ।

অন্ধকারে মৃদু হাসলো সালমা। হাত বাড়িয়ে ওর হাতের তাপ অনুভব করতে গেলে হাতজোড়া মুঠোর মধ্যে আলতো ধরে রাখলো আসাদ।

সালমা শিউরে উঠলো। প্রথমে রীতিমত ঘাবড়ে গেলো সে। ঈষৎ বিস্মিত হলো। তারপর চুপচাপ মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত স্টোভের দিকে। বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে তার। এই শীতের ভেতরেও মনে হলো সে যেন ঘামতে শুরু করেছে। কয়েকটি মুহুর্ত, বেশ ভালো লাগলো সালমার।

সে ওর মুখের দিকে তাকাবার সাহস পেলো না। হাতজোড়া টেনে নেবার কোন চেষ্টা করলো না। শুধু আধাফোটা স্বরে বললো, পানি গরম হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে গলাটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠলো।

তারপর এক সময় আস্তে হাতজোড়া টেনে নিলো সালমা।

নিঃশব্দে চা তৈরি করতে লাগলো সে।

চায়ের কাপে চামচের টুংটাং শব্দ।

আসাদ বললো, আমার কাপের চিনি একটু কম করে দেবেন।

সালমার মনে হলো আসাদের গলাটাও যেন কাঁপছে। যেন একটু আড়ষ্ট আর জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর।

অন্ধকারে বার কয়েক ওর শক্ত সবল হাতজোড়ার দিকে তাকালো সালমা। না। রওশন তার হারানো হাত দুটো কোনদিনও ফিরে পাবে না। একটা অশান্ত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে শিহরণ জাগিয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ নীরবে চায়ের পেয়ালায় চুকুম দিলো। ওরা। মিছিল, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, মুহূর্তের জন্য সবকিছু অনেক দূরে সরে গেলো।

তারপর।

তারও অনেক পরে।

আগে থেকে রিক্সা ঠিক করা ছিলো, দোরগোড়ায় তার ডাক শোনা গেলো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আসাদ বললো, কাপড় পরে নিন, সময় হয়ে গেছে।

সালমা অস্ফুট স্বরে কি যে বললো, বোঝা গেলো না।

বাইরে কনকনে শীত।

রিক্সায় এসে চুপচাপ বসলো ওরা।

সালমাকে মেয়েদের হোস্টেলে পৌছে দিয়ে আসাদ তখন ছেলেদের ব্যারাকে এসে ঢুকলো। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ টাইফুনের শব্দে স্লোগানের তরঙ্গ

জেগে উঠলো চারদিকে। অন্ধকারের বুক চিরে ধ্বনির বীজ ইথারে কাঁপনি সৃষ্টি করলো।

মুসলিম হল, নূরপুর ভিলা, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো এক সাথে। সে শব্দ তরঙ্গে অভিভূত হয়ে কে একজন ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, "বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে।"

ছেলেরা তখন কালো পতাকা উত্তোলন করছিলো।

সরু সিঁড়িটা বেয়ে ছাদের উপর উঠে এলো একদল ছেলে। মুনিম জিজ্ঞেস করলো, মই এনেছ তো?

হ্যাঁ।

দেখো মইটা খুব মজবুত নয়। সাবধানে উঠো; কালো পতাকাটা উড়িয়ে দাও।

পতাকাটা উড়িয়ে দেয়া হলে পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্লোগান দিলো ওরা। তারপর কেউ কেউ নিচে নেবে গেলো। আর কয়েকজন ছাদের ওপর পায়চারী করতে লাগলো নিঃশব্দে।

একপাশে, যেখানে কার্নিশটা বেশ চওড়া, সেখানে এসে বসলো মুনিম। কুয়াশা ছাওয়া আকাশে তখন তারারা নিভতে শুরু করেছে একটা একটা করে। রমনার আকাশে ধলপহর দিচ্ছে। মৃদু উত্তরা বাতাসে শীতের শেষ সুর। দু'একটা পাখি শাল, দেবদারু গাছের ফাঁকে কিচিরমিচির করে ডাকছে।

কার্নিশের উপর থেকে দেখলো মুনিম। তিন লরী পুলিশ এসে নাবলো মুসলিম হলের গেটে। সাথে একটা জীপ। জীপ থেকে নাবলেন পুলিশ অফিসাররা। গাট্টাগোট্টা চেহারা। চোখগুলো লাল লাল।

গেটটা বন্ধ ছিলো বলে বাইরে দাঁড়াতে হলো ওদের। দারওয়ানকে ডাকলো, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলো না। ফ্লগ ষ্ট্যাণ্ডে কালো পতাকাটা পত পত

করে উড়ছিলো। সে দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাত ঘষলো ওরা। ছেলেরা তখন স্লোগান দিতে শুরু করেছে। 'দমন নীতি চলবে না'। ছাদের উপর থেকে দ্রুত নিচে নেবে এলো মুনিম।

একটা ছেলে ওকে দেখতে পেয়ে বললো, আপনি ওদিকে যাবেন না মুনিম ভাই। আপনি পেছনে থাকুন।

আরেকটি ছেলে হাত ধরে পেছনের দিক টেনে নিয়ে গেলো তাকে।

খবরটা পেয়ে ইতিমধ্যে প্রভোষ্ট সাহেব এসে হাজির । মোটাসোটা দেহটা নিয়ে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিলেন তিনি, বুকটা দুরু দুরু করছিলো। শুকনো ঠোঁটজোড়া নেড়ে বারবার বিড়বিড় করছিলেন তিনি, কি আপদ, কি আপদ।

তাঁকে দেখে দারওয়ান সালাম ঠুকে গেট খুলে দিলো। গেট খুলতে পুলিশ অফিসাররা হুড়মুড় করে ঢুকতে যাচ্ছিলো, ছেলেরা চিৎকার করে উঠলো, আপনার ভেতরে ঢুকবেন না বলছি।

আহাহা কি হয়েছে, কি হয়েছে। হাত-পা নেড়ে একবার পুলিশ অফিসারদের দিকে আরেকবার ছাত্রদের দিকে তাকালেন তিনি।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তাঁর দেহটা কাঁপছে। ছেলেরা বললো, ওদের বাইরে দাঁড়াতে বলুন স্যার, ভেতরে এলে ভালো হবে না। আহাহা, আপনারা ভিতরে আসছেন কেন, বাইরে দাঁড়ান একটু। প্রভোষ্ট সাহেবের কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো পুলিশ অফিসাররা। ছেলেদের সঙ্গে এরপর কিছুক্ষণ বাচসা হলো প্রভোষ্টি সাহেবের। প্রভোষ্টি সাহেব বললেন, কি আপদ, কালো পতাকাটা এবার নাবিয়ে ফেললেই তো পারো তোমরা। নাবিয়ে ফেলো না।

বাজে অনুরোধ আমাদের করবেন না স্যার। নাবাবার জন্যে ওটা তুলি নি। ছেলেরা এক স্বরে বলে উঠলো।

নিরাশ হয়ে বার কয়েক মাথা চুলকালেন প্রভোষ্ট সাহেব। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, কি আপদ, কি আপদ।

পুলিশ অফিসারগুলোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো। তাই হুড়মুড় করে আরেক প্রস্থ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো তারা। ছেলেরা এগিয়ে এসে বাধা দিলো। আমরা ঢুকতে দিবো না বলছি, দেবো না।

তবু খাকি পোষাক পরা অফিসারদের সামনে এগুতে দেখে পরীক্ষণে অপরিসর বারান্দাটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। তারপর চিৎকার করে বললো, যেতে হলে বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাও, এমনিতে যেতে দেবো না আমরা।

পুলিশ অফিসারগুলো পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। একজন অফিসার আরেকজনের কানে ফিসফিসিয়ে বললো, আমাদের অত কোমল হলে চলবে কেন স্যার, শুনলে কিউ. খান সাহেব বরখাস্ত করে দেবেন। আমাদের। কিন্তু কেউ সাহস করলো না এগুতো।

মেডিকেলে মেয়েদের হোস্টেলের বা দিককার রুমটায় তিন-চারজন মেয়েকে নিয়ে বসে আলাপ করছিলো সালমা। বাইরে বারান্দায় বসে তখন কয়েকটি মেয়ে গান গাইছিলো, ওদের ভুলিতে পারি না, ভুলি নাই রে—। একটু আগে কালো পতাকা তুলেছে ওরা। এখনো সেই পতাকা তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলো। এমন সময়, হঠাৎ একটা বিরাট শব্দে চমকে উঠলো সালমা। বারান্দা থেকে একটি মেয়ে চিৎকার করে বললো, পুলিশ।

কোথায়? সালমা ছিটকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দেখালো ওই দেখো।

সালমা চেয়ে দেখলো পুলিশ বটে। ছাত্রদের ব্যারাক ঘেরাও করেছে। ওরা। সামনে দাড়িয়ে কিউ. খান নিজে। রাতে বড় কর্তার পাল্লায় পড়ে

মাত্রাতিরিক্ত টেনেছে। তার আমেজ এখনো যায় নি। মাথাটা এখনো ভার ভার লাগছে। চোখজোড়া জবা ফুলের মত লাল টকটকে।

মেডিকেল ব্যারাকের গোটটা পেরুতে কালো কাপড় দিয়ে ঘেরা শহীদ বেদীটা চোখে পড়লো কিউ, খানের। লাল চোখে আগুন ঠিকরে বেরুলো তার। আধো আলো-অন্ধকারে শহীদ বেদীটার দিকে তাকালে গাটা ছমছম করে ওঠে। আলকাতরার মত কালো কাপড়টা অন্ধকারকে যেন বিভীষিকাময় করে তুলেছে। আর তার ওপর যত্নে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য ফুলের মালা হিংস্র পশুর চোখের মত জুলছে ধিকিধিক করে।

কিউ. খানের ঈশারা পেয়ে একদল পুলিশ অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়লো শহীদ বেদীটার ওপর। কঞ্চির ঘেরাটা দুহাতে উপরে অদূরে নর্দমার দিকে ছুড়ে মারতে লাগলো তারা। কালো কাপড়টা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলো একপাশে। ফুলগুলো পিষে ফেললো বুটের তলায়। হঠাৎ একটা রক্ত গোলাপ মারাতে গিয়ে কিউ. খানের মনে পড়লো, যৌবনে একটি মেয়েকে এমনি একটি ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলো সে।

এক মুহুর্ত নীরব থেকে পিশাচের মত হেসে উঠলো কিউ. খান। হৃদয়ের কোমলতা তার মরে গেছে বহুদিন আগে।

ছেলেরা ইতিমধ্যে ব্যারাক ছেড়ে বেড়িয়ে জমায়েত হয়েছে বাইরে।

আর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে উত্তেজিত গলায়। কারো গায়ে গেঞ্জি, কারো লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই পরনে। কেউ কেউ গায়ে কম্বল চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। সকলে উত্তেজিত। ক্রোধে আর ঘৃণায় হাত-পাগুলো কঁপিছিলো। যেন পুলিশগুলোকে হাতের মুঠোয় পেলে এক্ষুণি পিষে ফেলবে ওরা।

হঠাৎ কিউ. খানের বন্য গলায় আওয়াজ শোনা গেলো ‘চার্জ’।

মুহুর্তে পুলিশগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের উপর।

ওসমান খান সীমান্তের ছেলে। ভয় কাকে বলে জানে না সে। ছাত্রদের বেপরোয়া মারতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশের মাঝখানে। ইয়ে সব ক্যায় হোতা হ্যায়, হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায়? দু'জন পুলিশকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো ওসমান খান। ছেলেরা সব পালাচ্ছিলো, ওসমান খান চিৎকার করে ডাকলো ওদের, আরে ভাগ্যতা হায় কিউ। ক্যা েয়া হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায়? কিন্তু পরীক্ষণে একজন লালমুখো ইন্সপেক্টর ছুটে এসে গলাটা টিপে ধরলো তার। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলো ওসমান খানের মুখের ওপরে। প্রথম কয়েকটা ঘুষি কোন রকমে সয়ে নিয়েছিলো সে।

তারপর হুঁশ হারিয়ে টলে পড়লো মাটিতে। রশীদ চৌধুরী এতক্ষণ লেপের তলায় ঘুমোচ্ছিলো। এসব হট্টগোল আর স্লোগান দেয়া ওর ভাল লাগে না। যারা এসব করে তাদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে। ও জানে শুধু দুটো কাজ। এক হলো সিনেমা দেখা আর দুই হলো সারারাত জেগে ফ্লাশ খেলা। এ দুটো নিয়ে মশগুল থাকে সে।

বাইরে হট্টগোল শুনে ব্যাপার কি দেখার জন্যে দরজা দিয়ে উকি মারছিলো সে। আমনি একটা পুলিশ হাতের ব্যাট দিয়ে গুতো মারলো ওর মুখের ওপর। অস্ফুট আর্তনাদ করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইছিলো রশীদ চৌধুরী। ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলেই পুলিশটা ওর গেঞ্জি চেপে ধরলো। ভাগতে হে কাঁহা, চালিয়ে।

রশীদ চৌধুরী বলির পাঠার মত কঁাপিতে লাগলো, আমি কিছু করি নি।

আরো-আরে এ কি হচ্ছে?

খামোস — ভয়ঙ্কর স্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো পুলিশটা ।

রশীদ চৌধুরী আবার তাকে বোঝাতে চাইলো যে, সে নির্দোষ। আমি কিছু করি নি, কসম খোদার বলছি। কিন্তু ওতে কোন ফল লাভ হলো না দেখে এবার রীতিমত গরম হয়ে উঠলো রশীদ চৌধুরী। চিৎকার করে সে তার বন্ধুদের ডাকলো। ভাইসব— তারপর স্লোগান দিতে লাগলো উত্তেজিত গলায়।

ভোরে আসার কথা ছিলো। আসতে বেলা হয়ে গেলো। ওর। ছাইদানের ওপর রাখা সিগারেট থেকে শীর্ণ ধোয়ার রেখা সাপের মত একেবেঁকে উঠে বাতাসে মিইয়ে যাচ্ছে। বিছানা শূন্য। কোচেও কেউ বসে নেই।

বাথরুমে ঝাপঝপ শব্দ হচ্ছে পানি পড়ার। বজলে চারপাশে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটি ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে ছবি দেখতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর পানি পড়ার শব্দ বন্ধ হলে, তোয়ালে দিয়ে মাথার পানি মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। এই যে তুমি এসে গেছ, তাহলে। ও হেসে বললো, ওই পত্রিকার নিচে সিগারেটের প্যাকেট আছে নিয়ে একটা ধরাও। বজলে শুধালো,সাহানাকে দেখছি না, ও কোথায় গেলো? চুলে তেল মাখছিলো মাহমুদ, মুখ না ঘুরিয়েই বললো, আর বলো না, ওর সঙ্গে কাল বাঢ়ে বিস্ত্রী রকমের ঝগড়া হয়ে গেছে আমার!

হঠাৎ?

না, ঠিক হঠাৎ নয়। ক'দিন থেকে সম্পর্কটা বড় ভলো যাচ্ছিলো না। ক্ষণিক বিরতি নিয়ে মাহমুদ আবার বললো, তুমিতো জান, ওর ব্যাপারে কোনদিন কোন কার্পণ্য করি নি আমি। যখন যা চেয়েছে দিয়েছি, কিন্তু কি জানো, মেয়েটা এক নম্বরের নিমকহারাম, বড় নির্লজ্জ, আর- ওসব কথা শুনে তোমার কাজে নেই। থেমে আবার নতুন কিছু বলতে যাচ্ছিলো মাহমুদ। বজলে বাধা দিয়ে বললো, কিন্তু সে গেলো কোথায়?

মাহমুদ ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললো, চলে গেছে, ভোরে উঠে। ওর মালপত্র নিয়ে বুঝলে বজলে, একটা কথা না বলে চলে গেছে।

যাক, মরুকগে, আমার কি? চুলের ওপর চিরুনি বুলোতে বুলোতে মুখটা বিশ্রীভাবে বাঁকালো মাহমুদ।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ম্যাগাজিনের ওপর আবার চোখ নাবালো সে।

হ্যাঁ, যে কথা বলার জন্য ডেকেছিলাম বজলে—।

হুঁ, বলো। পত্রিকাটা টেবিলের ওপর নাবিয়ে রাখলে সে। দেয়ালে টাঙানো ওর নিজের ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, মুনিম তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না?

এ ধরনের প্রশ্ন আশা করে নি বজলে। তাই প্রথমে সে কিছুক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে গেলো। তারপর আস্তে করে বললো, না, ঠিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। তবে তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। কিন্তু, কেন বল তো?

না, এমনি। থেমে আবার বললো মাহমুদ, ওর সম্পর্কে তোমার ধারণাটি কি বলতো, মানে ছেলেটা কেমন?

সিগারেটে একটা জোর টান দিলো বজলে, তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, দেখো ব্যক্তি হিসেবে ওকে বেশ ভাল লাগে আমার। তবে ওর রাজনৈতিক আদর্শকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন করছো আমায়?

মাহমুদ সহসা কোন জবাব দিলো না। তারপর যখন সব কিছু খুলে বললো তখন আর কিছু অস্পষ্ট রইলো না বজলের কাছে। বজলের উচিত মুনিমের সঙ্গে খুব সদভাব রাখা। ওর আস্থাভাজন হওয়া। তারপর ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে ভেতরের খবরগুলো সব অতি সাবধানে বের করে নেয়া। কোথায় থাকে সে, কি করে, কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এসব জেনে মাহমুদকে বলা। এর বিনিময়ে তার কর্তাদের কাছ থেকে ওকে একটা মোটা টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মাহমুদ। কোন খাটুনী নেই। অথচ ফিয়াসেকে নিয়ে আমোদস্ফুর্তিতে থাকার মত অনেক টাকা পাবে সে।

অর্থাৎ তুমি আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বলছি, তাই না? অল্প একটু হেসে গভীর হয়ে গেলো বজলে।

না, ঠিক তা নয়, বুঝলে বজলে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মাহমুদ ইতস্তত করছিলো। প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে নিয়ে বজলে ধীরে ধীরে কেটে কেটে বললো, দেখো মাহমুদ, তুমিতো আমাকে জান, জীবন সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা দর্শন আছে, সেটা হলো, কারো ক্ষতি না করা, কাউকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া। ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। আমি চাই নিরুপদ্রুব অথচ সুন্দর জীবন। আমাকে ওসব জটিলতার ভেতর না টানলে ভালো হয় না?

একটু আগের হালকা আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন একটু গুমোট বলে মনে হলো মাহমুদের। উভয়ে খানিকক্ষণের জন্যে মৌন হয়ে রইলো। অবশেষে মৌনতা ভেঙ্গে বজলে বললো, তুমি কি এখন বেরুবে কোথাও?

দেয়ালে একটা টিকটিকি খাবারের তালাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, সেদিকে চেয়ে থেকে মাহমুদ বললো, না, এ বেলা কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই, ঘরেই থাকবো।

একটু পরে বজলে উঠে দাঁড়ালো, দুপুরের দিকে ডলি হয়তো আসতে পারে এখানে, এলে বসতে বলো, আমি আবার আসবো- বলে আর অপেক্ষা করলো না।

ও চলে গেলে কিছুক্ষণ চোেখ মুদে চুপচাপ বসে রইলো মাহমুদ। হাত ঘড়িটা দেখলো বার কয়েক। ন'টা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি।

এতক্ষণে তার এসে যাবার কথা। মাহমুদ বিড়বিড় করে বললো, এখনো এলো না যে? উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো সে। জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতে শিকারি কুকুরের মত কানজোড়া খাড়া হয়ে গেলো তার।

হ্যাঁ, তারই পায়ের শব্দ। মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেলো। একটু পরে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার চেহারা দেখা গেলো। মাহমুদ মৃদু হেসে ডাকলো, এসো।

চারপাশে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে ভেতরে এসে কোঁচের উপর বসলো সবুর।

মাহমুদ উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো, এত দেরি হলো যে?

সবুর একটা ক্লান্তির হাই তুলে বললো, হলে কয়েকটি ছেলে এ্যারেষ্ট হয়েছে, ওদেরে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাই আসতে দেরি হয়ে গেলো। বলে আরেকবার চারপাশে তাকালো সে।

মাহমুদ সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তারপর কি খবর বলো।

সবুর মৃদু হেসে বললো, গতকাল যে রিপার্টটা পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন তো?

মাহমুদ মাথা সামনে একটু ঝুকিয়ে বললো, হ্যাঁ পেয়েছি।

সবুর বললো, আমাকে এখুনি আবার ফিরে যেতে হবে হলে। আজকের রিপোর্টটা বিকেলে পাঠিয়ে দেবো। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো?

হ্যাঁ, তোমাকে ডেকেছিলাম, বলতে গিয়ে কি যেন ভাবলো মাহমুদ। তোমাকে ডেকেছিলাম, হ্যাঁ, শোন, একটু সাবধানে থেকে আর তোমার রিপোর্টগুলো খুব ভাসা ভাসা হয়ে যাচ্ছে, আরো একটু বেশি করে ইনফরমেশন দেবার চেষ্টা করো।

সবুর আহত হলো। কেন, ইনফরমেশন কি আমি কম দিই।

না না, সে কথা আমি বলছি নে। শব্দ করে হেসে পরিবেশটাি হাল্কা করে দিতে চাইলো মাহমুদ। বললো, আরো ইনফরমেশন থাকা দরকার। আমি সে কথা বলছিলাম।

আচ্ছা। ভবিষ্যতে তাই চেষ্টা করবো। সবুর উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো সে।

মাহমুদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বললো, কি? সবুর বললো, আমার এ মাসের বিলটা এখনো পাইনি। ও হ্যাঁ, তোমার বিল তৈরি হয়ে আছে, দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টাকে লাগলো। মাহমুদ। সবুরের পায়ের শব্দটা একটু পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো সিঁড়ির ওপর।

বেলা নটা দশটা থেকে ছেলেরা বিভিন্ন হল, কলেজ আর স্কুল থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে দলবদ্ধভাবে না এসে একজন দু'জন করে আসছিলো ওরা। কারণ শহরে তখনো একশ' চুয়াল্লিশ ধারা পুরোপুরিভাবে বহাল রয়েছে। জীপে চড়ে পুলিশ অফিসাররা ইতস্তত ছুটোছুটি করছে রাস্তায়। কয়েকটি রাস্তার মোড়ে ষ্টেনগান আর ব্রেনগান নিয়ে রীতিমত ঘাটি পেতে বসেছে ওরা।

শহরের চারপাশ থেকে ছেলেরা যেমন আসছিলো তেমনি সাথে করে নতুন নতুন খবর নিয়ে আসছিলো। ওরা। একদল ছেলে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করতে করতে মধুর স্টলে এসে ঢুকলো। আসাদ কাছেই বসেছিলো। ওদের। ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

আমরা নবকুমার স্কুল থেকে।

আর আপনারা?

আমরা জগন্নাথ কলেজ।

ও দিককার খবর কি?

সাতজনকে এ্যারেষ্ট করেছে।

আরে, ডাঃ জামান যে, তোমাদের হোস্টেলে নাকি পুলিশের হামলা হয়েছিলো। ব্যাপার কি?

তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোট সতেরোজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তার মধ্যে সাতজন মেয়ে। ওর কথায় চমকে উঠলো আসাদ।

সালমার কথা মনে পড়লো। ক্ষণিক নীরব থেকে আগ্রহের সাথে সে প্রশ্ন করলো, মেয়েদের হোস্টেলেও হামলা হয়েছিলো বুঝি?

হয়েছিলো মানে, রীতিমত কুরুক্ষেত্র। জামান হেসে জবাব দিলো।

মেয়েরা অবশ্য একহাত দেখিয়েছে এবার। সেই পঞ্চাশ সালের কথা মনে নেই? তখন স্টাইকের সময় আমরা দোরগোড়ায় শুয়ে পড়েছিলাম। আর মেয়েরা সব আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে টপকে ক্লাশে গিয়েছিলো। সেই পাজী মেয়েগুলো এখন আর নেই। ওগুলো প্রায় সব বেরিয়ে গেছে। এখন নতুন যারা এসেছে তারা বেশ ভালো।

জামান থামলো।

আসাদ ভাবছিলো সালমা গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কি ভেবে প্রশ্ন করলো না সে।

পাশের টেবিলে তখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো আরেক দল ছেলে।

একজন ডাকলো, বলাই এদিকে এসো। মধু, কোথায় মধু?

এদিকে দু'কাপ চা দাও মধুদা।

খাবার আছে কিছু? যা আছে নিয়ে এসো, ভাল করে খেয়ে নিই। যদি এ্যারেক্ট হয়ে যাই তো ক্ষিধেয় মরবো।

কি ব্যাপার, একটা সন্দেশ চেয়ে চেয়ে হয়রান হয়ে গেলাম, এখনি কালো পতাকা তুলতে যেতে হবে, কইরে বলাই, একটা সন্দেশ কি দিবি জলদি করে?

ব্যাটা অপদার্থ, তাড়াতাড়ি কর।

মুনিমকে এদিকে আসতে দেখে আসাদ উঠে দাঁড়ালো। মুনিমের হাতে দুটো কালো পতাকা আর এক বান্ডিল কালো ব্যাজ। বান্ডিলটা টেবিলের ওপর

নাবিয়ে রেখে মুনিম বললো, আর দেরি করে কি লাভ। ছেলেরা প্রায় সব এসে গেছে। এখন কালো পতাকাটা তুলে দিই, কি বল আসাদ?

আসাদ কোন জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে কে যেন একজন চিৎকার করে ডাকিলো, মুনিম ভাই, আসুন, আর কত দেরি।

পাশ থেকে রাহাত বললো, দাঁড়ান মুনিম ভাই, একটু দাঁড়ান। এক কাপ চা খেয়ে নিই।

সবুর দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। ওর কথা শুনে সে জুলে উঠলো ভীষণভাবে, তোমাদের শুধু খাওয়া আর খাওয়া, কেন, একদিন না খেলে কি চলে না।

তোমার চলতে পারে আমার চলে না। রাহাত রেগে উঠলো। মুনিম বললো, হয়েছে তোমরা এখন ঝগড়া বঁধিয়ো না, কালো পতাকা তুলতে কারা কারা যাবে এসো আমার সঙ্গে।

কয়েকজন ছেলে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সিঁড়ি বেয়ে একটু পরে উপরে উঠে গেলো মুনিম।

নিচে, মধুর স্টলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংঘবদ্ধ হলো বাকি ছেলেরা, সংখ্যায় হয়তো শ'চার-পাঁচেক হবে ওরা। বয়সের তারতম্যটা সহজে চোখে পড়ে। কারো বয়স ষোল সতেরোর বেশি হবে না। কারো চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। কারো গায়ের রঙ কালো। কারো গৌরবর্ণ। করো পরনে পায়জামা, কারো প্যান্ট। কিন্তু সংকল্পে সকলে এক। প্রতিজ্ঞায় অভিন্ন।

একটু পরে মুনিম আর তার সাথীদের ছাদের উপর দেখা গেলো। ওরা কালো পতাকা তুলছে। পূবালি সুর্যের সোনালি আভায় চিকচিক করছে ওদের মুখখানা। কালো পতাকা উড়ছে আর শ্লোগানের শব্দে ফেটে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

সার বেঁধে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো অদূরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে। গাছের ছায়ায়।

রাহাত মুখে গুনলো এক, দুই, তিন, চার, পাচ, ছয়, সাত। সাত গাড়ি পুলিশ এসেছে রে, ওই দেখ, সাত গাড়ি পুলিশ এসেছে। সবুর ঠোঁট বাঁকালো। এতেই ঘাবড়ে গেলে বুঝি? সব পিঁপড়ে, পিঁপড়ে; একেবারে কাপুরুষের দল। এর চাইতে মায়ের কোলে বসে চুকচুক করে দুধু খাওয়া উচিত ছিলো তোমাদের।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো বলছি, নইলে—। রাহাত ঘুষি বাগিয়ে উঠেছিলো, দৌড়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরলো আসাদ। একি হচ্ছে, একি করছে তোমরা। ছি-ছি। ঘৃণায় দেহটা রি-রি করে উঠলো। তারা ওদের দিকে কিছু কালো ব্যাজ আর আলপিন এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, কালো ব্যাজ পরাও সকলকে, তোমরাও পরো।

ছেলেরা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইতস্তত দল বেঁধে বেঁধে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। কেউ আলোচনা করছে পুলিশ নিয়ে। কেউ ভাবছে যদি জেলে যেতে হয়। কেউ ভাবিছে, যারা জেলে গেছে তাদের কথা।

কয়েকটি ছেলেকে ঘুরে ঘুরে কালো ব্যাজ পরাচ্ছিলো। কারো শার্টের পকেটে, কারো কাঁধের ওপর। আসাদ এগিয়ে গেলো তাদের দিকে। আপনারা অমন ঘুরঘুর করছেন কেন? সবাই এক জায়গায় জমায়েত হোন, ওদের ডাকুন। তারপর সে নিজেই ডাক দিলো, ভাইসব-। তার ডাকে ছেলেরা এসে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো আম গাছতলায়। মেয়েরাও এসে পৌছেছে। এতক্ষণে। বারোজন মেয়ে। পরনে সবার কালো পাড় দেয়া শাড়ি ! চোখেমুখে সবার আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি। রাহাত বললো, আপনাদের আর সবাই কোথায়?

নীলা বললো, ওরা আসবে না।

কেন?

ওদের ভয় করে। আম গাছতলায় ছেলেদের পাশে ওর সাথীদের বসিয়ে রেখে নীলা সোজা মুনিমের কাছে এলো। কই ব্যাজ দিন, আমরা এখনো ব্যাজ পাইনি।

আমার কাছে তো নেই, আসাদের কাছে। হাত দিয়ে অদূরে দাঁড়ানো আসাদকে দেখিয়ে দিলো সে। পুলিশ অফিসাররা তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রক্টারের সঙ্গে কি যেন আলাপ করছিলো অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে।

ছেলেরা ওদের দিকে তাকিয়ে আলাপ করছিলো।

তুমি কি মনে করো, পুলিশের ভেতরে আসবে।

আসবে মানে, দেখছে না। ওরা ভেতরে আসার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

হলেই হলো নাকি, আমরা ওদের ভেতরে ঢুকতে দেবাে না।

আমরা এখানে শুয়ে পড়বো। তবু ঢুকতে দেবো না ওদের।

আমরা এখানে জান দিয়ে দেবো, তবু—।

আহ, আপনারা থামুন, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, একটু চুপ করুন।

মুনিমের গলা শোনা গেল একটু পরে। কিন্তু সোরগোল থামানো গেলো না। কে একজন চিৎকার করে উঠলো। ওই যে আরো দু লরী পুলিশ আসছে, দেখো দেখো।

দু লরী নয়, তিন লরী, তাকে শুধরে দিলো আরেকজন। দেখেছে। মাথায় লোহার টুপি লাগিয়েছে ওরা, যেন যুদ্ধ করতে এসেছে।

প্রক্টর সাহেবকে সাথে নিয়ে তিনজন পুলিশ অফিসার লনটা পেরিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো ছেলেদের দিকে। ইনসাপেক্টর রশীদের বুকটা কাঁপছিলো ভয়ে। কে জানে ছাত্রদের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না। কাছে গেলে কেউ যদি একটা ইট ছুঁড়ে মারে মাথার ওপর, তাহলে?

উহ্ কেন যে এই পুলিশ লাইনে এসেছিলাম। অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে ওঠে ইনসপেক্টর রশীদ।

পাশ থেকে কিউ. খান জিজ্ঞেস করেন, কি বললেন?

বড় সাহেবের প্রশ্নে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে যায় ইন্সপেক্টর রশীদ।

সামলে নিয়ে বললেন, না না, ও কিছু না স্যার। বলছিলাম কি, এই ছেলেগুলো বড় বেশি বেড়ে গেছে, এদের আচ্ছা করে ঠেঙ্গানো উচিত।

হুম, ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসি খেলে গেলো কিউ. খানের।

ওদের এদিকে এগুতে দেখে ছেলেরা এমন বিকটভাবে চিৎকার জুড়ে দিলো যে, কে কি বলছিলো ঠিক বোঝা গেল না। আসাদ এগিয়ে এসে থামাতে চেষ্টা করলো। ওদের। কিন্তু কেউ থামলো না।

ইন্সপেক্টর রশীদ বার কয়েক ইতস্তত করে বললো, আমাদের কথাটা আপনারা একটু শুনবেন কি?

আপনাদের কথা আমরা শুনতে চাই না।

আপনারা এখান থেকে চলে যান।

এটা কি পুলিশ ব্যারাক নাকি?

এটা বিশ্ববিদ্যালয়।

এখানে কে ঢুকতে দিয়েছে আপনাদের?

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান। এখান থেকে।

রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেলো কিউ. খানের। বার কয়েক দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি।

তারপর ইশারায় সাথীদের ফিরে আসতে বলে, নিজেও ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। কপালে তার ভাবনার ঘন রেখা। কি করা যেতে পারে এখন?

এদিকে ছেলেরা তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

ওদের কিছুতে এদিকে আসতে দেবো না আমরা।

না মুনিম ভাই, আপনি না বললে কি হবে। আমরা ওদের বাধা দেবোই। ইট মেরে ওদের মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমরা। সবার গলা ছাপিয়ে সবুরের গলা শোনা গেলো, ভাইসব, তোমরা ইট জোগাড় কর। আমরা জান দেবো। তবু মাথা নোয়াবো না। আমরা বীরের মতো লাগবো- ইট জোগাড় করো।

ওর কথাটা শেষ না হতে কে একজন চিৎকার করে উঠলো, পুলিশ।

আরেকজন বললো, পালাও, পালাও।

অদূরে, শ'খানেক পুলিশ অর্ধবৃত্তাকারে ছুটে আসছে ছাত্রদের দিকে।

মাথায় ওদের হেলমেট, হাতে একটা করে লাঠি। লোহার নাল লাগানো বুট জুতো দিয়ে শ্যামল দুর্বঘাসগুলো মাড়িয়ে ছুটে আসছিলো ওরা।

ছুটে আসছিল দু'চোখে বন্য হিংস্রতা দিয়ে। পালাও, পালাও-

এর মাঝে আরেকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, ভাইসব, পালিও না, রুখে দাঁড়াও। সে কণ্ঠস্বর আসাদের। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চাপা পরে গেলো চারদিকের উন্মত্ত কোলাহলে।

ভাইসব পালিও না। সমস্ত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো আসাদ।

সামনে তাকিয়ে দেখলো পুলিশগুলো প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে তার। পেছনে একটা ছেলেও দাঁড়িয়ে নেই, সকলে পালাচ্ছে। শুধু পাঁচটি মেয়ে ভয়ার্তা চোখ মেলে বসে আছে ওর পেছনে- আম গাছতলায়। ভাইসব...। শেষ বারের মত ডাকতে চেষ্টা করলো আসাদ। পরীক্ষণে একটা লাঠি এসে পড়লো ওর কোমরের ওপর।

আর একটা।

আরো একটা আঘাত।

টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলো আসাদ। পাশ থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় বললো, এ্যারেস্ট হিম। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল তাদের ইস্পাত দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলো তাকে।

আসাদের মনে পড়লো বায়ান্ন সালের এমনি দিনে প্রথম যে দশজন ছেলে চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিলো তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো সে।

সেদিনও সবার আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো তাকে।

আর আজ তিন বছর পর সেই দিনটিতে সে আবার সবার আগে বন্দি হলো। বাণিজ্য ভবনের দিকে যারা পালাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে মেয়েও ছিলো। একজন। শাড়িতে পা জড়িয়ে কংক্রিটের রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেয়েটা। জীবনে কোনদিন পুলিশের মুখোমুখি হয়নি। তাই ভয়ে মুখখানা সাদা হয়ে গেলো তার। কলজেটা ধুকধুক করতে লাগলো গলার কাছে এসে। মনে মনে সে খোদাকে ডাকলো। খোদা বাচাও। পরীক্ষণে চেয়ে দেখলো একটা কনস্টেবল লাঠি উচিয়ে ছুটে আসছে। ওর দিকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে মেয়েটা চোখজোড়া বন্ধ করলো।

পুলিশ ভ্যানে উঠে দাঁড়াতে আসাদ পেছনে তাকিয়ে দেখলো, আম গাছতলায় বসে থাকা সে পাঁচটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হচ্ছে এদিকে। নীলা আছে, রানু আর রোকেয়াও আছে। ওদের দলে।

ওরা হাত তুলে অভিবাদন জানালো ওকে। তারপর এগিয়ে গেলো আরেকটি পুলিশ ভ্যানের দিকে। ওদের দিক থেকে চোখজোড়া সরিয়ে আনতে আসাদ চমকে উঠলো। রাহাতও গ্রেপ্তার হয়েছে। কপাল চুইয়ে দরদর করে রক্ত ঝরিছে ওর। সাদা জামাটা ভিজে লাল হয়ে গেছে রক্তে। কাছে আসতে দু'হাতে ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিলো আসাদ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলো সে। মেয়েরা তখন পাশের ভ্যান থেকে স্লোগান দিচ্ছিলো, বরকতের খুন ভুলবো না। শহীদের খুন ভুলবো না।

আরো জন কয়েক ছেলেকে এনে তোলা হলো প্রিজন-ভ্যানের ভেতরে। তাদের মধ্যে একজনের কাধের ওপর লাঠির ঘা পড়ায় হাড়টা ভেঙ্গে গিয়েছে।

তাই ব্যথায় সে কাতরাচ্ছিলো আর ফিসফিস করে বলছিলো, হাতটা আমার ভেঙ্গে গিয়েছে একেবারে, মাগো ব্যথায় যে মরে গেলাম।

কি, তোমরা চুপ করে কেন স্লোগান দাও।

আসাদ স্লোগান দিলো, শহীদের স্মৃতি।

আর সকলে বললো, অমর হোক।

ছাত্রদের কাছ থেকে প্রথম প্রতিরোধ এলো লাইব্রেরির ভেতরের দরজায়, দুটো টেবিল টেনে এনে দরজার ওপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো। ওরা। একটি ছেলে চিৎকার করে ডাকলো, আরো টেবিল আন এদিকে, আরো, আরো। দরজা আটকে ফেলো, যেন ওরা ঢুকতে না পারে।

ওদের এখানে ঢুকতে দেবো না আমরা।

না কিছুতে না।

ওরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছিলো তখন কিছু সংখ্যক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সেলফ থেকে কয়েকটা বই নাবিয়ে সুবোধ বালকের মত পড়তে বসে গেলো। বাইরে যে এত কিছু ঘটে গেলো যেন। ওসবের সাথে কোন যোগ ছিলো না ওদের। যেন অনেক আগে থেকে এমনি পড়ছিলো ওরা। এখনো পড়ছে।

ওদের দিকে চোখ পড়তে ঘৃণায় দেহটা বার কয়েক কেঁপে উঠলো বেনুর। চোখজোড়া জুলাপোড়া করে উঠলো। একটা ছেলের হাত থেকে ছোঁ। মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে তীব্র গলায় বেনু তিরস্কার করে উঠলো, আপনার লজ্জা করে না এখন বই পড়ছেন, ওদিকে আপনার বন্ধুদের কুকুরের মত মারছে। আপনার লজ্জা করে না।

কয়েকটি ছেলে লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কয়েকজন উঠলো না। আগের মতো বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলো তারা। একজন ছেলে গলা চড়িয়ে বললো, থাক, ওদের পড়তে দাও। কাপুরুষদের শান্তিতে থাকতে দাও।

তোমরা সকলে এদিকে এসো। পুলিশগুলোকে এখানে কিছুতে ঢুকতে দেবো। না। আমরা। কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে পুলিশগুলো ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সেখানে। শুধু সেখানে নয়, মেয়েদের কমনরুমে, অধ্যাপকদের ক্লাবে, বাণিজ্য ভবনে, দোতলার করিডোরে, সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে পুলিশের।

ঘুম ঘুম চোখে পায়ের শব্দটা কানে আসছিলো তার। ভেজানো দরজাটা ঠেলে কে যেন ঢুকলো ভেতরে। পায়ের শব্দ ঘরের মাঝখানে এসে শ্লথ হয়ে গেলো, তারপর থেমে গেলো এক সময়

মাহমুদ চোখ মেলে তাকালো এতক্ষণে। চোখেমুখে অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ডলি। ও আপনি বসুন। শুয়েছিলো, উঠে বসলো মাহমুদ। ওর দিকে ভালো করে তাকাতে সাহস হলো না ডলির। গত রাতের কথা মনে হতে অকারণে আরক্ত হলো সে। টিয়ে রঙের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সামনের কোচটিতে বসে পড়লো ডলি। পরনে তার হলদে ডোরা কাটা শাড়ি। গায়ে সিফানের ব্লাউজ। চুলগুলো সুন্দর বেণি করা। কপালে চন্দনের একটা ছোট্ট ফোটা আর কানে একজোড়া সাদা পাথরের টব। ডলিকে বেশ লাগছিলো দেখতে।

বার কয়েক ইতস্তত করে ওর দিকে না তাকিয়েই ডলি জিজ্ঞেস করলো, বজলের আসার কথা ছিলো, ও কি এসেছিলো এখানে?

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওপাশের বড় জানালাটা খুলে দিলো মাহমুদ, তারপর বললো, এসেছিলো, আপনাকে বসতে বলে গেছে।

ডলি হতাশ হলো। আসবে তো বলে গেছে, কিন্তু কখন আসবে তার কি কোন ঠিক আছে। এতক্ষণ কি করে এখানে অপেক্ষা করবে ডলি?

দু'জনে চুপ করে ছিলো। মাহমুদ নীরবতা ভেঙ্গে একটু পরে বললো, শহরের কোন খবর জানেন?

ডলি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলো না। পরে বুঝতে পেরে বললো, না। কিছু জানে না সে ।

মাহমুদ বললো, ইউনিভার্সিটি থেকে কয়েকশ' ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। কার কাছ থেকে শুনলেন?

কণ্ঠস্বরে ওর ব্যগ্রতা দেখে একটু অবাক না হয়ে পারলো না মাহমুদ।

বললো, সারা শহর জানে আর আপনি জানেন না?

এ কথার পর চুপ করে গেলো ডলি। আর কোন প্রশ্ন তাকে করলো না। মাহমুদ লক্ষ্য করলো ডলি যেন বড় বেশি গভীর হয়ে গেছে। কিছু ভাবছে সে, কিন্তু অত গভীরভাবে কি ভাবতে পারে ডলি?

একটু পরে ডলি জিজ্ঞেস করলো, কেন গ্রেপ্তার করা হলো ওদের?

মাহমুদ না হেসে পারলো না। হেসে বললো, বড় বোকার মত প্রশ্ন করলেন। আপনি, বিনে কারণে কি ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে? ওরা আইন অমান্য করেছিলো। ক্ষণকাল থেকে মাহমুদ আবার বললো, ওদের নেতা কি যেন নাম ছেলেটার, হ্যাঁ, মুনিম, ওকে নিশ্চয় চিনেন আপনি?

ডলি চমকে উঠে বললো, কই নাতো, আপনি কার কাছে শুনলেন?

মাহমুদ মৃদু হেসে বললো, বজলের বন্ধু কিনা, তাই ভাবলাম সে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

ডলি মাটিতে চোখজোড়া নাবিয়ে রেখে ঈষৎ ঘাড় নাড়লো, না বজলে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় নি ডলির।

আলোচনার ধারাটা হয়তো অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই একটু পরে ডলি জিজ্ঞেম করলো, উনি কোথায়, ওনাকে দেখছি না যে?

মাহমুদ বুঝতে না পেরে বললো, কার কথা বলছেন?

ডলি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, কেন আপনার ওয়াইফ?

ওয়াইফ? মাহমুদ যেন চিৎকার করে উঠলো, আমার ওয়াইফ?

তারপর হো হো করে হেসে উঠে বললো। ও সাহানার কথা বলছেন?

কে বলেছে ও আমার ওয়াইফ, ও নিজে বুঝি?

ডলি ঘাড় নেড়ে বললো, না, অন্যের কাছ থেকে শুনেছি।

কে সে?

বজলে।

বজলে? মাহমুদ আবার শব্দ করে হেসে উঠলো। তাহলে আপনি ভুল শুনেছেন। সাহানা আমার বোন। বলে হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো সে।

ডলির ভালো লাগলো না। সব কিছু যেন কেমন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিলো তার কাছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এক সময় উঠে দাঁড়ালো সে।

মাহমুদ সচকিত হয়ে বললো, একি আপনি চললেন নাকি?

ডলি ওর দিকে না তাকিয়েই বললো, বজলে এলে বলবেন, শরীরটা আমার খুব ভালো লাগছিলো না। তাই চলে গেলাম।

আচ্ছা তাই বলবো। ও চলে যেতে চাওয়ায় যেন স্বস্তি পেলো। কে জানে, সাহানা সম্পর্কে যদি আরো কিছু জিজ্ঞেস করে বসতো? ডলি চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে বজলেকে গালাগালি দিলো মাহমুদ। আস্ত একটা ইডিয়ট। তারপর গুনগুন করে একটা ইংরেজি গানের কলি ভাজতে লাগলো সে। একটু পরে তাকেও বেরুতে হবে বাইরে।

লালবাগে যখন প্রথম পুলিশ ভ্যানটা এসে পৌছলো বেলা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। শুকনো ধুলো উড়ছে বাতাসে। হলদে রোদ চিকচিক করছে লালবাগের মাঠের ওপর। যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিলো বিদেশী বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সেই মাঠে।

পুলিশ ভ্যানটা গেটের সামনে এসে থামতে, কবি রসুলকে দেখতে পেলো আসাদ। পরনে তার একটি লুঙ্গি। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলো কবি রাসুল। কোত্থেকে ধরেছে তোমাদের?

ইউনিভার্সিটি থেকে।

এখানে ক'জন?

এখানে আমরা আঠারো জন। আরো অনেককে ধরেছে। ওদেরও এখনি নিয়ে আসবে। সকালে যারা ধরা পড়েছিলো, তারা সকলে ঘিরে দাঁড়ালো নতুন অভ্যাগতদের। হাতে হাত মেলালো ওরা। তারপর রাহাতের দিকে চোখে পড়তে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, একি, ওর মাথা ফাটলো কেমন করে?

আসাদ বললো, ইউনিভার্সিটিতে লাঠিচার্জ করছে ওরা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

পাশে একজন দারোগা দাঁড়িয়েছিলো। কবি রসুল তার দিকে তাকিয়ে রেগে উঠলো। কি সাহেব তামাশা দেখছেন বুঝি? ছেলেটা তো মারা যাবে। একটা ডাক্তার ডাকুন না।

এখানে ডাক্তার ডাকার কোন নিয়ম নেই। দারোগা জবাব দিলো; বলেন তো তাকে হাসপাতালে পাঠাই।

হয়েছে, আপনাকে অত দরদ দেখাতে হবে না। সবুর মাটিতে থুথু ছিটিয়ে বললো। লোকগুলোকে দেখলে ঘেন্নায় বমি আসে আমার। যান যান সাহেব, এখান থেকে দূরে সরে যান।

এমন অপ্রত্যাশিত অপমানের কথা শুনে রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো লোকটার। কিন্তু কিছু বলতে সে সাহস করলো না। চুপচাপ সরে গেলো একপাশে। মেডিকেলের ছেলেরা বললো, আপনারা ঘাবড়াবেন না, জখমটা তেমন মারাত্মক নয়, আমরা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। বলে ওরা এগিয়ে এসে রাহাতকে

ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসালো। ওসমান খান বললো, একটু গরম পানি আর কিছু আয়োডিন দরকার।

দাঁড়ান দেখি জোগাড় করতে পারি। কিনা। ওকে আশ্বাস দিয়ে থানা ইনচার্জের কাছ থেকে আয়োডিন আর গরম পানি আনার বন্দোবস্ত করতে গেলো কবি রসুল।

পুলিশ ভ্যান থেকে নামবার আগ পর্যন্ত আসাদ ভেবেছিলো সালমার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে সে কি আগের মত সহজভাবে কথা বলতে পারবে।

গত রাতের কথা বারবার করে মনে পড়ছিলো তার।

থানা অফিসের পাশে লম্বা ব্যারাকটার সামনে আরো সাত-আটটা মেয়ের মাঝখানে বসে ওদের কি যেন বোঝাচ্ছিল সালমা। দেখে আসাদ বুঝলো ওরা মেডিকেলের মেয়ে। সকালের হোস্টেল থেকে ধরা পড়েছে ওরা। কারো পরনে সেলওয়ার, কারো পরনে শাড়ি।

আসাদকে দেখে ফিক করে হেসে দিলো সালমা। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, বেশ আপনিও ধরা পড়েছেন তাহলে?

কি করবো বলুন, আপনাদের ছেড়ে থাকতে পারলাম না।

আসাদের কথায় মুখখানা ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠলো সালমার। চোখজোড়া মাটির দিকে নাবিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো সে। কে জানে হয়তো গত রাতের কথা মনে পড়েছে তার, আসাদ ভাবলো।

একটু পরে সালমা ইতস্তত করে বললো, আমরা ভোর রাতেই এ্যারেস্ট হয়েছি।

হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি।

কার কাছ থেকে শুনলেন? ভ্রূজোড়া স্বল্প বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো সালমা। আসাদ বললো, আপনার সহপাঠীদের কাছ থেকে।

ও, সালমা মৃদু হেসে মুখখানা অন্য দিকে ঘুরিয়ে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। না। গতরাতের কথা এখন আর মনে নেই তার। সব ভুলে গেছে মেয়েটি, আসাদ ভাবিলো। ভেবে কেন যেন মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো তার।

ভার্সিটির মেয়েদের নিয়ে তখন দ্বিতীয় প্রিজন-ভ্যানটা এসে পৌঁছেছে লালবাগে। ওদের দেখতে পেয়ে শিশুদের মত আনন্দে হাততালি দিতে দিতে সেদিকে এগিয়ে গেলো। মেডিকেলের মেয়েরা। এই যে নীলা যে, এসো এসো। ছুটে এসে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সালমা।

রানু বললো, বাহ সালমা আপা তুমি? বেশ ভালোই হলো একসঙ্গে থাকা যাবে।

সালমা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা ক'জন?

নীলা জবাব দিলো, পাঁচ। তাহলে পাঁচ আর আট মিলে আমরা তেরোজন হলাম।

হ্যাঁ, তেরোজন মেয়ে আমরা। সালমা বললো।

আসাদ কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ফোঁড়ন কেটে বললো, আমাদের তুলনায় কিন্তু সমুদ্রে বারিবিন্দু।

হয়েছে, হয়েছে অত বড় বড় কথা বলবেন না। নীলা ঠোঁট বাঁকালো।

দেখেছি আপনাদের সাহস। পুলিশ দেখে সব বেড়ালের মত পালিয়েছেন আবার কথা বলেন। আমরা পালাই নি, হুঁ।

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো আসাদ। এমন সময় আরো একটা পুলিশ ভ্যান এসে থামালো সেখানে।

আরো এক দল ছেলে।

আরো একদল মেয়ে।

তারপর বেলা যত পড়তে লাগলো, গ্রেপ্তার করে আনা ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও তেমনি বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে।

কাঁটা তার আর পুলিশ ঘেরা মাঠটাির মধ্যে গোল হয়ে বসলো ছেলেরা মেয়েরা। আর তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কখন জেলখানায় নিয়ে যাবে। তাদের সকলের মুখে হাসি, চোখে শপথের কাঠিন্য।

হঠাৎ একসময় সবার মাঝখান থেকে অপূর্ব দরদ নিয়ে নীলা গান গেয়ে উঠলো। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে -।

তারপর সে গাইলো, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

ওর গান শুনে কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন বোবা হয়ে গোলো। কি এক গভীর মৌনতা চারপাশ থেকে এসে গ্রাস করলো। ওদের।

খানিকক্ষণ পরে আবার কলকল করে কথা বলে উঠলো। ওরা। কবি রসুল একজন দারোগাকে ডেকে বললো, কি ব্যাপার, আমাদের কি এখানে ফেলে রাখবেন নাকি?

আর একজন জিজ্ঞেস করলো, জেলখানায় কখন নেবেন?

এখানে আর ভালো লাগছে না। জেলে নিতে হয় নিয়ে চলুন। উহ্ এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না। আপনারা। ওদের হৈ হট্টগোলের একপাশে চুপচাপ বসেছিলো মুনিম। লাঠির আঘাত লেগে বা চোখটা ফুলে গেছে তার। নীলার গান শুনে বারবার ডলির কথা মনে পড়ছে, ডলিও তো নীলার মত আসতে পারতো। এখানে। কেন সে এলো না? ভাবতে গিয়ে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো মুনিমের।

ওকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বেনু বললো, কি ভাবছেন মুনিম ভাই?

না, কিছু না। চোখ তুলে বেনুর দিকে তাকালো মুনিম। দেহের গড়নটা একটু ভারি গোছের। চেহারাখানা সুন্দর আর কমনীয়। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে বেনু। কোন আবিলতা নেই, কলুষতা নেই। আর কাজ পেলে কি খুশিই না

হয় মেয়েটা। দুহাতে কাজ করে, ওর দিকে তাকিয়ে মুনিমের আবার মনে হলো, ডলি কেন বেনুর মত হলো না। বেনু ওর পাশে বসলো।

ফোলা চোখটার দিকে দৃষ্টি পরতে বললো লাঠির আঘাত লেগেছিলো, তাই না মুনিম ভাই?

মুনিম সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ। বেনু বললো, মেডিকেলের ছেলেদের বললে ওরা সুন্দরভাবে ব্যান্ডেজ করে দেবে। বলবো ওদের? বেনুর উৎকণ্ঠা দেখে অবাক হলো মুনিম। বেনু আবার বললো, বলবো? মুনিম সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো। না। বেনু আর কিছু বললো না। চুপচাপ রোদে চিকচিক করা অসমতল মাঠটার দিকে চেয়ে রইলো।

অদূরে বসা সালমা আসাদকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর আগে কোনদিন জেলে যান নি?

গেছি।

ক'বার?

তিনবার।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আসাদ মুদু হাসলো। চেয়ে দেখলো মাটির দিকে চোখ নাবিয়ে কি যন ভাবলো সালমা। কে জানে, হয়তো গত রাতের কথা ভাবছে সে। কিম্বা ভাবছে তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা। কি ভাবছে জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না আসাদের।

মাঠের ও পাশটায় এরা বসেছিলো।

ওপাশটায় তখন কবি রসুল একজন পুলিশ অফিসারের ওপর রেগে গিয়ে বলছে, এই রোদের ভিতের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন। এখানে। জেলে কি নেবেন না নাকি?

নেবো, নোবো, এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন। এখনি নেবো। জবাবটা তাড়াতাড়ি সেরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেলো পুলিশ অফিসারটা। সবুর মাটিতে থুথু ছিটিয়ে বললো, লোকগুলোকে দেখলে ঘেন্নায় বমি আসে আমার, তোমরা কেমন করে যে ওদের সঙ্গে কথা বলো। বলে আবার মাটিতে থুথু ছিটালো সে।

কেউ কিছু বললো না।

পরপর তিন চারখানা পুলিশ বোঝাই গাড়ি উত্তর থেকে দ্রুত দক্ষিণ দিকে চলে গেলো। এক নজর সেদিকে তাকিয়ে দেখলো বজলে তারপর মৃদুপায়ে আবার হাঁটতে লাগলো।

মিরেন্ডারে বসে এক কাপ চা খাবে।

কাচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে সাহানাকে একা বসে থাকতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো বজলে।

ওকে দেখতে পেয়ে সাহানা স্নান হাসলো, চা খেতে এলেন বুঝি?

বজলে ওর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বললো, হঁ্যা। আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ।

আরেক কাপ খান আমার সঙ্গে।

সাহানা হ্যাঁ না কিছু বললো না। বয় এসে দাঁড়িয়েছিলো। বজলে দু'কাপ চা আনতে বললো তাকে।

বয় চলে গেলে বজলে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, এখন কোথায় আছেন আপনি?

সাহানা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বজলের দিকে। তারপর বললো, মাহমুদের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিলো, এর মধ্যে?

বজলে বললো, হ্যাঁ সকালে ওর ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সাহানা মাথা নিচু করে কয়েক মুহুর্ত নীরব থেকে বললো, আমি এখন সেগুন বাগানে আমার এক বান্ধবীর বাসায় আছি। ও! বজলে মুদু স্বরে বললো। বয় এসে চা রেখে গেলো টেবিলের উপর। পটের ভেতর এক চামচ চিনি ঢেলে দিয়ে সাহানা বললো, ও নিশ্চয় আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে আপনাকে।

বজলে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বললো, না ও কিছু বলে নি আপনার সম্পর্কে।

নিশ্চয় বলেছে, আপনি লুকোচ্ছেন আমার কাছ থেকে। অদ্ভুতভাবে হাসলো সাহানা। পেয়ালার চা ঢালতে ঢালতে আবার বললো, জানেন, লোকটা বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো আমায়। আর এখন বলে, না। আমি ও রকম কোন কথাই দিই নি। ক্ষণকাল থেমে আবার সে, তখন কত অনুনয়, তোমার ভালবাসা পেলে স্বর্গ মর্ত্য এক করে দেবো, আর এখন? জোচ্চোর কোথাকার।

বজলে মাথা নিচু করে ছিলো। চোখ তুলে এবার তাকালো ওর দিকে। পরনে একখানা কলাপাতা রঙের পাতলা শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগানো। চুলগুলো গোলাকার খোপা করা। ডলির চেয়ে কম সুন্দরী নয় সাহানা। চায়ের কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে সাহানা আবার বললো, ও ভেবেছে চিরকাল আমি করুণার ভিখিরি হয়ে থাকি। উর্বর চিন্তা বটে। বলে অদ্ভুতভাবে হাসলো সাহানা।

তারপর চায়ের পেয়ালায় মৃদু চুমুক দিয়ে বললো, থাক ওসব কথা, আপনার কি খবর বলুন! চা খেয়ে বেরিয়ে কোথায় যাবেন।

বজলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, কিছু ঠিক নেই, এমনি একটু ঘুরে বেড়াবো।

সাহানা বললো, আমার ওখানে চলুন না।

বজলে শুধালো কোথায়?

সেগুন বাগানে। ওকে অবাক করে দিয়ে অপূর্ব গলায় সাহানা বললো। ওরা সবাই দেশের বাড়িতে গেছে। বাসাটা খালি। রাতের বেলা একা থাকতে বড় ভয় করবে আমার। চলুন না, আপনিও থাকবেন। সাহানার দু'চোখে আশ্চর্য আমন্ত্রণ।

চুল থেকে পা পর্যন্ত ওর পুরো দেহটার দিকে এক পলক তাকালো বজলে। ডলিকে মনে পড়লো। ও যদি জানতে পারে? না ও মোটেই জানতে পারবে না। সিগারেটে একটা জোর টান দিলো বজলে। তারপর কাঁপা গলায় বললো। আচ্ছা যাবো।

ওর চোখে চোখ রেখে ঠোঁটের কোণে সুক্ষ্ম হাসি ছড়ালো সাহানা। মিরেন্ডার থেকে বেরিয়ে একখানা রিক্সা নিলো ওরা। ওর কানের কাছে মুখ এনে বজলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। সাহানা বললো, ডলি গেলো।

ডলি? বজলে আঁতকে উঠলো। কোথায় দেখলেন তাকে?

সাহানা বললো। এইতো রিক্সা করে গেলো ওদিকে।

মুহুর্তে মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেলো বজলের।

ওকি দেখেছে আমাদের?

সাহানা হেসে দিয়ে বললো, তা কেমন করে বলবো। বলে ওর হাতে একটা মৃদু চাপ দিলো সাহানা। ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো বজলে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধুকধুক করছে।

আকাশের পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো ধীরে ধীরে।

দিনের ক্লান্তি শেষে, রাত আর স্নিগ্ধতা নিয়ে আসছিলো পৃথিবীর বুকে। কর্মচঞ্চল শহর রাত্রির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বিষন্ন বিকেলে হঠাৎ মৌনতার গভীর সমুদ্রে ডুব মেরেছিলো যেন।

জেল গেটের সামনে বন্দি ছাত্র-ছাত্রীদের জড়ো করা হলো এনে। একজন নয় দু'জন নয়। আড়াইশ'র ওপর সংখ্যা ওদের।

খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন খোঁজ নিতে এসেছেন। কার কি প্রয়োজন কাগজে টুকে নিচ্ছেন চটপট।

সালমার বিছানাপত্তর আর কাপড়-চোপড় নিয়ে শাহেদ এসেছিলো।

হোল্ডল আর সুটকেসটা সামনে নাবিয়ে রেখে সে বললো, নে আপা তোর জিনিসপত্রগুলো সব দেখে নে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, জলদি করা।

কেন, তুই কোথায় যাবি? সালমা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

শাহেদ বললো। বারে, তোদের যে ধরে এনেছে তার প্রতিবাদ ধর্মঘট করবো না বুঝি?

সালমা মনে মনে খুশি হলো। বললো, দেখো তুমি যেন দুষ্টুমি করো না। তাহলে কিন্তু খুব রাগ করবো।

তুই আমায় কি মনে করিস আপা? আমি দুষ্টুমি করি? শাহেদ আহত হলো। এইতো এখন গিয়ে পোস্টার লিখতে বসবো। পাড়ার ছেলেদের সব বলে রেখেছি। আজ রাতের মধ্যে দু'শ পোস্টার লাগানো চাই, কি মনে করেছিস তুই? বলে চলে যাচ্ছিলো শাহেদ।

কি মনে পড়তে ফিরে এসে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে এগিয়ে দিলো সালমার দিকে।

দিতে ভুলেই যাচ্ছিলাম, নে দুলাভাইয়ের চিঠি।

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলো সালমা।

আসাদ বললো, কার চিঠি?

সালমা ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো, ও লিখেছে, রাজশাহী জেল থেকে। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। নীলা ডাকলো।

সালমা এসো আমাদের নাম ডাকছে।

অস্ফুট কণ্ঠে আসি বলে, চলে গেলো সালমা।

গত রাতের কথা সে একেবারে ভুলে গেছে। স্বামীর চিঠিখানা কত যত্ন করে রেখেছে হাতের মধ্যে, আসাদ ভাবলো।

আর ভাবতে গিয়ে মনটা কেন যেন ব্যথা করে উঠলো তার।

সাহানাকে দেখে তেমন অবাক হয় নি। মুনিম, জানতো সে আসতে পারে।

অবাক হলো ওর সঙ্গে ডলিকে দেখে।

সাহানা বললো, ডলি এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রথমে কিছুক্ষণ একটা কথাও মুখ দিয়ে সরলো না মুনিমের। অপ্রত্যাশিত আনন্দে বোবা হয়ে গেছে সে।

ডলি এগিয়ে এসে এক মুঠো ফুল ওঁজে দিলো ওর হাতের মধ্যে। কিছু বললো না। মাটিতে চোখ নাবিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

মুনিম মৃদু গলায় বললো, হয়তো দীর্ঘদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ডলি।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। স্বল্প অন্ধকারেও মুনিম দেখলো ডলির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে। আনন্দে মনটা নেচে উঠছিলো বারবার। আর সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলো ডলিকে। ডলির এমন রূপ আর কোনদিন চোখে পড়ে নি মুনিমের।

আসাদ এসে ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলো। তোমার বাসা থেকে কেউ আসেনি মুনিম?

আমেনা এসেছিলো। মুনিম জবাব দিলো। কাপড়-চোপড়গুলো ওই দিয়ে গেছে। মা নাকি খবর শুনে কাঁদতে শুরু করেছেন। মাকে নিয়ে আমার এক জ্বালা। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো মুনিম।

আসাদ সরে গেলো অন্য দিকে। ওর কেউ আসেনি। মা যার নেই দুনিয়াতে কেউ বুঝি নেই তার। হঠাৎ মারা মায়ের কথা মনে পড়ায় মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো আসাদের।

নাম ডেকে ডেকে তখন একজন করে ছেলেমেয়েদের ঢোকান হচ্ছিলো জেলখানার ভেতরে।

নাম ডাকতে ডাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলার সাহেব। এক সময়ে বিরক্তির সাথে বললেন, উহ্ এত ছেলেকে জায়গা দেবো কোথায়। জেলখানাতো এমনিতে ভর্তি হয়ে আছে।

ওর কথা শুনে কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবে না।

আর একজন বললো, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।

সমাপ্ত